"শ্রেণী সংগ্রামের বুনিয়াদী পথ থেকে সরে আসায় সি পি আই (এম)-এর বামফ্রন্ট মডেল ভেঙ্গে পড়েছে। সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে অনুশীলনের জগতে শ্রেণীসমঝোতাবাদী আত্মসমর্পণকারী লাইন গ্রহণ করে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জনগণ এবং তাদের সেই সমস্ত সংগ্রাম থেকে যেগুলো গণতান্ত্রিক প্রশ্ন ও আকাঙ্খাকেই প্রতিবিম্বিত করে। সমস্ত সংগ্রামী বামশক্তিগুলো নতুনভাবে সংগঠিত হোক, জনগণের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে বাম আন্দোলন ও বাম রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটুক। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নয়নের সবচেয়ে অবিচল ও নিষ্ঠাবান শক্তি হিসাবে প্রকৃত বামপন্থীদের এগিয়ে যেতে হবে সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা রেখে।"

বামফ্রন্ট সরকারের পতন

ও

বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জ

সুমন্ত ব্যানার্জী
প্রভাত পট্টনায়েক
হীরেন গোহাঁই
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
অরিন্দম সেন

বামফ্রন্ট সরকারের পতন ও
বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জ

"আজকের দেশব্রতী" প্রকাশনা

বামফ্রন্ট সরকারের পতন ও
বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জ

"আজকের দেশব্রতী" প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ ঃ ২১ জানুয়ারী, ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২ এপ্রিল, ২০১২

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

প্রকাশনা স্থান ঃ ২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা - ১৪
দূরভাষ ঃ ২২৬৫১৬৭৯

মুদ্রক ঃ ক্যালকাটা গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
৩এ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মানিকতলা
কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত

বিষয়সূচী

মুখবন্ধ ৭

পশ্চিমবাংলার পরবর্তী পাঁচ বছর ও ভারতীয় বামেদের ভবিষ্যৎ
— সুমন্ত ব্যানার্জী ৯

বামেদের পড়ন্ত দশা
— প্রভাত পটনায়েক ২২

বামেদের পড়ন্ত দশা—একটি সমালোচনা মূলক ভাষ্য
— হীরেন গোহাইঁ ৩২

এক বাম পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে
— দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ৩৬

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রায় এবং তারপর
— অরিন্দম সেন ৪৩

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের বিপর্যয় এবং
ভারতীয় বামপন্থীদের সামনে উঠে আসা চ্যালেঞ্জ
(২৮-২৯ মে, ২০১১ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে
প্রকাশিত সারা ভারত বাম সমন্বয়ের বিবৃতি) ৫১

সি পি আই (এম)-এর বিংশতি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব
সত্যকে অস্বীকার করে আর কতকাল?
— রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ৫৭

প্রকাশনার কথা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন দশকের বামফ্রন্ট রাজত্বের অবশেষে লাগাতার প্রবল জনরোষ, গণবিক্ষোভ, গণআন্দোলন ও গণরায়ের মধ্য দিয়ে পতন হয়েছে। ঐ সরকার সর্বস্বতার সি পি আই (এম) মার্কা সুবিধাবাদী 'বাম' ধারার মডেলটি শাসনক্ষমতাচ্যুত এমন এক নজীরবিহীন সংকটের আবর্তে পতিত হয়েছে যার মধ্যে বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের কোনও শর্ত আর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সি পি আই (এম) মডেলটি যদি ক্ষমতার বিনিময়ে বামপন্থার সংগ্রামী মতাদর্শ-রাজনীতি-সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়ার অধঃপতনের জন্য চিহ্নিত ও ধিক্কৃত হয়ে থাকে, তবে ঐ জ্বরা কবলিত মডেলটিকে কেন্দ্র করে নানা ময়না-বিশ্লেষণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। নানারকম উপসংহারও টানা হচ্ছে। সি পি আই (এম) সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রচুর প্রশ্ন-বিক্ষোভ-তর্কাতর্কি চলতে থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সি পি আই (এম)-এর নীতি নির্ধারণকারি অধঃপতিত নেতৃত্বের অবস্থান অনড়। অন্যদিকে,বামফ্রন্ট সরকারের পতনের মধ্যে দিয়ে বামপন্থার সব শেষ হয়ে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে বলে বুর্জোয়া প্রচারও প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। কিন্তু না, পর্যুদস্ত বামফ্রন্ট মডেলের বিপরীতে পশ্চিমবাংলায় সংগ্রামী বামপন্থার এক স্বাধীন বাম ধারারও ঐতিহ্য ও প্রবহমানতা রয়েছে, যার সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার শাসনক্ষমতায় কায়েম হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের জোট সরকার। এর বিপরীতে বামপন্থার নতুন এক শক্তিশালী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জও থাকছে—থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রকৃত বামপন্থী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে কিছু তুলনামূলক অধ্যয়নের সুযোগ করে দিতে 'ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' ও 'লিবারেশন' প্রকাশনায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী রচনা সংকলন এবং ২০১০ সালে দিল্লীতে গঠন হওয়া "সারা ভারত বাম সমন্বয়"-এর পক্ষ থেকে গৃহীত ও প্রচারিত বিবৃতি এখানে "বামফ্রন্ট সরকারের পতন ও বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জ" সংকলিত পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হল। ব্যাপকতম পরিসরে সংবেদনশীল বাম সংগঠক ও কর্মীবাহিনীর চিন্তা-চেতনায় ছাপ ফেলতে সহায়ক হওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ। সেই উদ্দেশ্য পূরণ হলেই প্রকাশনার উদ্যোগ সার্থক হবে।

সম্পাদকমন্ডলী
আজকের দেশব্রতী

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

"বামফ্রন্ট সরকারের পতন ও বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক এই পুস্তিকাটি প্রথমবার প্রকাশিত হয় গত ২১ জানুয়ারী '১২। তার মাত্র একমাসের মধ্যেই এক হাজার কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। কলকাতা বইমেলায়ও পুস্তিকাটি বিক্রীর পরিমাণ ছিল বেশ নজরকাড়া। তারপরেও চাহিদা রয়েছে বেশ ভালোরকম। এইসব বিচার করে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আরও পরিবর্দ্ধিত আকারে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তার অঙ্গ হিসেবে আরও দুটি প্রতিবেদনের সংযোজন করা হয়েছে। একটি হল, "ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি"-তে প্রকাশিত অন্যতম এক সমাজতান্ত্রিক হীরেন গোহাইঁ লিখিত পর্যালোচনা, অপর পর্যালোচনাটি নেওয়া হয়েছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র "লিবারেশন" থেকে। গ্রন্থনায়ও কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আর বলাবাহুল্য, কলেবর কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় কিঞ্চিৎ মূল্যও বাড়াতে হয়েছে। পুস্তিকার এই দ্বিতীয় সংস্করণ চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে আশা রেখে কথা শেষ করা যাক।

সম্পাদকমণ্ডলী
"আজকের দেশব্রতী"

পশ্চিমবাংলার পরবর্তী পাঁচ বছর ও ভারতীয় বামেদের ভবিষ্যৎ

।। সুমন্ত ব্যানার্জী।।

সামগ্রিকভাবে নিন্দিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) [সি পি আই (এম)]-কে প্রত্যাখ্যান এবং অত্যন্ত সন্দেহজনক তৃণমূল কংগ্রেসকে (টি এম সি) বেছে নেওয়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমণ্ডলী পুরানো নীতিবাক্যটিকে পাল্টে তাকে নতুন এক নীতিবাক্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন ঃ "খুব চেনা শয়তানের থেকে আধ চেনা শয়তান ভাল।"

একদিকে রাজ্যে বিগত তিন দশক ধরে একটি বামপন্থী সরকারের নেতৃত্বে সি পি আই (এম) যে সমস্ত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ও দুষ্কর্ম করেছে তার দাম তাকে মেটাতে হয়েছে। অপরদিকে পরবর্তী পাঁচবছর ধরে নির্বাচকমণ্ডলী একইরকম বা আরও খারাপ বিচার-বুদ্ধিহীন তৃণমূল কংগ্রেস চালিত জোটকে ক্ষমতায় আনার জন্য নিজেদেরই অভিসম্পাত দেবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে বিজয়ীপক্ষ ও তার সমর্থককূল রীতিমত উদ্দীপিত। মমতা ব্যানার্জীর জয়ের কারণ হিসেবে তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে যে বিষয়গুলো সদ্ব্যবহার করেছেন সেগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে (১) সি পি আই (এম)-এর উদ্ধত নেতা, কর্মী ও বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চ ল জুড়ে পঞ্চ ায়েতী মোড়লদের দ্বারা সংগঠিত দৌরাত্ম্যগুলোর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত জনরোষ;(২) নাগরিক সমাজের টুঁটি চেপে ধরা সি পি আই (এম)-এর কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদগ্র তাগিদ—যে নাগপাশ নিয়োগ থেকে পদোন্নতি—তাদের পেশাগত জীবিকার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে নির্ধারণ করেছে ও বাড়ী তৈরী থেকে বাড়ী বিক্রি—দৈনন্দিন জীবনের পদে পদে খবরদারি জারি রেখেছে এবং (৩) আরো ভাল কোন বিকল্পের অভাবে উল্লিখিত উভয় অংশের অসন্তুষ্ট নির্বাচকদের সামনে শেষ বিচারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে পছন্দ বলতে কেবল তৃণমূলেরই উপস্থিতি। কিন্তু তৃণমূল অত্যন্ত চড়া দামে এই জয় অর্জন করেছে—যে সম্পর্কে পরে আলোচনায় আসা যাবে।

মমতা ব্যানার্জী ভোটারদের মধ্যেকার দুটি প্রবণতার একসাথে মেলবন্ধনের জন্য মঞ্চ হাজির করেন—অংশত তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে থাকা সি পি আই (এম) বিরোধী মানসিকতা এবং অংশত সুশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা ও কর্মস্থানের প্রশ্নকে ঘিরে তাদের মধ্যে এক পরিবর্তন বা বদলের আকাঙ্খা। তাদের পছন্দ রাজনৈতিক ছিল না বরং তা ছিল নিতান্তই অস্তিত্বের প্রয়োজনে। ১৯৭৭ থেকে ২০১১-র সরকার বিরোধী জনাদেশের মূল পার্থক্য এইখানেই।

মতাদর্শগত দিশা ছাড়াই

১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট (জরুরী অবস্থা দ্বারা কলঙ্কিত কংগ্রেসের বিপরীতে) আর্থ-সামাজিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের এক বিকল্প রাজনৈতিক প্যাকেজ হাজির করে। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলো

পালন করার ক্ষেত্রে তাদের যে বিশ্বাসঘাতকতা তা এক ভিন্ন কাহিনী এবং সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনায় যাব। যত ত্রুটিযুক্তই হোক—সেই সময়কার বাম কর্মসূচীর মধ্যকার রাজনৈতিক চরিত্রের তুলনায়—আজকের তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সংস্কৃতি কোন দিক থেকেই পরিবর্তনের কোন মতাদর্শগত দিশা লক্ষিত হয় না। ১৯৭৭-এর মতাদর্শগত বাঁধনে আবদ্ধ সমভাবাপন্ন বহুদলীয় বামফ্রন্টের বিপরীতে তৃণমূল হল এমন একটি দল যা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে রয়েছে একটিমাত্র ব্যক্তির মোহিনী ভাবমূর্তির ওপর যিনি কয়েকটি বামপন্থী শ্লোগানকে আত্মসাৎ করেছেন, এবং বিপরীতধর্মী বিভিন্ন মতের সমর্থকদের জড়ো করে এক জগাখিচুড়ি জোট গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রাক্তন কংগ্রেসীদের থেকে শুরু করে বিক্ষুব্ধ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সুযোগসন্ধানী মাওবাদী ক্যাডার, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা এবং বৃহৎ শিল্পমহলের দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধি পর্যন্ত সকলেই সামিল হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাঁর নির্বাচনী প্রচারাভিযান এক চিত্তাকর্ষক অনবদ্য জন আকর্ষণী ক্ষমতাকে হাজির করেছে—যার লক্ষণ, এক গরিবমুখী নেত্রীর (পরনে যাঁর আটপৌরে শাড়ি এবং মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকায় যিনি সাদামাটা বাড়ীতে বাস করেন) জনমোহিনী ভাবমূর্তি ও তার সাথে সাথে মিডিয়াপ্রেমী, চটজলদি সমাধান ও তাৎক্ষণিক দাওয়াই বাতলানো এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের চটকদারিতে সিদ্ধহস্ত এক রাজনীতিবিদের নিপুণ মিশ্রণ। এর উদাহরণ, দশ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে তাঁর ঘোষণা (দক্ষ বেকারবাহিনীর কথা মাথায় রেখে) এবং কলকাতাকে লণ্ডন বানানোর তাঁর কথিত প্রতিশ্রুতি (যার লক্ষ্য হল ওপরের দিকে উঠছে এমন উচ্চ-মধ্যবিত্ত যুবকদের রুচিকে তৃপ্ত করা)। মা-মাটি-মানুষের প্রতি অনুগত থাকার দাবি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মনোজগত লণ্ডনের ঔপনিবেশিক মডেলেই আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর শাসনকালে রাজ্যের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা কেমন হবে এ থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

বামফ্রন্টকে প্রত্যাখ্যান করার নেতিবাচক ভোট আর তৃণমূলের অধীনে সুশাসনের প্রতিশ্রুতির সপক্ষে ইতিবাচক ভোট—এই দুই নির্বাচনী ঝোঁকের ক্ষণকালের সহাবস্থানে খুবই নতুন সরকার সম্পর্কে জনমানস আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোল খেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে আগামীদিনের আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যাদের সবচেয়ে মাথাব্যথা—এই দ্ব্যর্থবোধকতা সেই কর্পোরেট মহলের নজর এড়ায়নি। মমতা ব্যানার্জীর বিজয়ের প্রত্যাশায় সংবাদ মাধ্যমের উচ্ছ্বাসের মাঝে, ভোটের ফল প্রকাশের প্রাক্কালে শিল্পমহলের এক প্রতিনিধি বিষয়টিতে 'মোক্ষম' ধাক্কা দিয়ে লেখেন—

"মনে হয় খুব কম লোকই তাঁকে ভোট দিতে চায় বরং সবাই চায় সি পি এমের বিরুদ্ধে ভোট দিতে, যার অর্থ ... বাংলা সি পি এম-কেই বেশী ঘৃণা করে ... যার অর্থ মমতাকে টিকে থাকতে হলে কাজ করে দেখাতে হবে ... যার অর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য যথেষ্টই উন্মুক্ত থাকবে।" (সুরজিৎ এস ভাল্লা, অক্সাস ইনভেস্টমেন্টসের চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৩ মে ২০১১)

বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে আগামী পাঁচ বছর মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিকভাবে

টিকে থাকাটা সুনিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু রুটি-রুজির নিরিখে যাঁরা তাঁকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছেন তাঁদের কাছে এই সময় পর্বে তিনি কাজের মধ্য দিয়ে কী পার্থক্য রাখেন সেটাই দেখার।

'পরিবর্তন' না 'প্রত্যাবর্তন'?

নির্বাচনী প্রচারের সময় এই শব্দ দুটি নিয়েই তৃণমূল এবং সি পি আই (এম)-এর মধ্যে তরজা হয়েছে। প্রথম পক্ষ তিন দশক ধরে একচেটিয়া ক্ষমতায় থাকা ব্যর্থ বামফ্রন্টকে হটিয়ে "পরিবর্তন" আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; আর দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৭৭ সালে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোকে দীর্ঘদিন ভুলে থাকার পর সেগুলোকে এবার যাতে পূরণ করা যায় সে জন্য ভোটারদের কাছে তাদের ক্ষমতায় "প্রত্যাবর্তন" ঘটানোর আবেদন জানিয়েছে। পরিবর্তনের আওয়াজ তুলে তৃণমূল বিজয় হাসিল করায় মমতা ব্যানার্জী বদলে দেওয়ার যে আশা জাগিয়েছিলেন নতুন সরকারকে তা রূপায়িত করতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে মানুষের প্রত্যাশাগুলোর সারসংকলন করা যেতে পারে—(১) সি পি আই (এম)-এর স্থানীয় স্তরের ক্ষমতালোভী নেতা ও কর্মীদের হিংস্র হামলায় যা ছারখার হয়ে গেছে গ্রামাঞ্চলে সেই অতিবাঞ্ছিত শান্তিকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা;(২) গণবণ্টন ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত প্রশাসন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর মত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো চালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতিগুলোর অবসান ঘটানো ও (৩) কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত, সামাজিক ন্যায়ের নিশ্চয়তা ও নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সমাজের পুনর্গঠন।

কিন্তু এই সমস্ত প্রত্যাশাকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মেঘ ঝুলে রয়েছে। শান্তির জন্য যে আকাঙ্খা তাকে তৃণমূল কর্মীদের দ্বারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ঘটনাগুলো গ্রাস করে ফেলছে—যা সম্প্রতি বেশ কিছু সি পি আই (এম) সমর্থকের হত্যা ও বিভিন্ন জায়গায় সি পি আই (এম)-এর পার্টি অফিস ভাঙ্গচুরের ঘটনার মধ্য দিয়ে সপ্রমাণ হচ্ছে। এই প্রবণতা যদি বাড়তে থাকে তাহলে এই সেদিনও যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার কর্মী সি পি আই (এম) হার্মাদদের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করছিলেন এবং (সেজন্য) বামফ্রন্টকে হারাতে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে সামিল হচ্ছিলেন—তাদের সামনে তা এক চ্যালেঞ্জ হাজির করবে। এই আশঙ্কা আরো প্রকট হয় যখন তৃণমূলের নব নির্বাচিত ১৮৪ জন বিধায়কের গঠন বিন্যাস চোখে পড়ে। তাদের ৬৯ জনের বিরুদ্ধেই মারাত্মক ফৌজদারী অপরাধের দায়ে আদালতে মামলা রয়েছে। এই তথ্য প্রার্থীদের নিজেদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রাটিক রিফর্মস এণ্ড নিউ ইলেকশনস্ ওয়াচ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ভারতের মূল ধারার সাথে যুক্ত হওয়ার পথে যেখানে দাগী অপরাধীরা নির্বাচকদের প্রিয় বলে মনে হয়। দুর্নীতির প্রশ্নকে ধরলে, বছর খানেক আগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যাঁরা তৃণমূল দলের প্রার্থীদের পঞ্চায়েতে নির্বাচিত করেছেন তাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝেছেন যে ঐসব লোকেরা তাদের পূর্বসূরী সি পি আই (এম)-এর থেকে ভাল কিছুই নয় এবং তারা সেই একই স্বজনপোষণের রাস্তাতেই চলেছে এবং একইভাবে সরকারি অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত সিন্দুকে পাচার করছে—যেটা পূর্বের বামফ্রন্ট আমলে গ্রামাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। ঘটনা হল, খোদ তৃণমূল কংগ্রেসেরই

এক সাংসদ কবীর সুমন তাঁর দলের প্রার্থীরা পঞ্চায়েতগুলো দখল করার অব্যবহিত পরই তাদের বেমক্কা লুঠপাটের বিরুদ্ধে রীতিমত সোচ্চার হন। তাদের তিনি রাক্ষুসে পেটুক—যারা সর্বদাই "খাও ... খাও" বলে চেঁচাচ্ছে বলে বর্ণনা করেন। তথাপি, সেই তৃণমূলকেই বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামের লোকেরা ভোট দিয়েছেন। এটা তাঁদের নিতান্ত অসহায়তা এবং নৈরাশ্যপূর্ণ বিতৃষ্ণাকেই দেখিয়ে দেয়। তাঁরা এই সত্যটাকেই মেনে নিয়েছেন যে ক্ষমতায় আসা যে কোন দলেরই মত তৃণমূলও জাঁকিয়ে দুর্নীতি করবে। কিন্তু তাঁরা এই আশাও করেন যে এর ফলে অন্তত কিছুদিনের জন্যও শান্তি ফিরে আসবে ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সরবরাহের ব্যাপারটা নিশ্চিত হবে।

মমতা এবং কর্পোরেট স্বার্থ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের মত দীর্ঘমেয়াদী বৃহত্তর বিষয়টির কথা এলে, মমতা ব্যানার্জীকে অরণ্যে হারানো এক শিশুর মতই মনে হবে, যে চ্যালেঞ্জগুলোকে ভবিষ্যতে তাঁকে মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যা সামলেছেন তার চেয়েও ঢের বেশী বেয়াড়া চ্যালেঞ্জ এখানে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন উড়নচণ্ডীর মত যখন তখন নতুন নতুন উচ্চগতির ট্রেন উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি জট পাকিয়ে বসেছিলেন; দেখেননি আর্থিক দিক দিয়ে সেসব উপযোগী হবে কিনা অথবা যাত্রী সুরক্ষা থাকবে কিনা। যার ফলে রাজস্বেরও ক্ষতি হয়েছে, দুর্ঘটনার বহরও বেড়েছে। তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে এই রেকর্ডের নিরিখে দেখলে, একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের "দুরন্ত" (তাঁর আদরের শব্দ—যা দিয়ে তিনি নতুন প্রবর্তিত ট্রেনগুলোর নামকরণ করেছিলেন)-টি চালান তা দেখার জন্য আমরা সভয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

তাঁর গর্বভরে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর মাত্র কয়েকটি দিয়েই শুরু করা যেতে পারে—যে জমি এখনও আইনত টাটার মালিকানাধীন সিঙ্গুরের ছোটগাড়ী প্রকল্পের আওতায় রয়েছে—সেই ৪০০ একর জমি কী করে তিনি প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেবেন? টাটাকে সরকার থেকে প্রভূত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কিংবা একটা লম্বা আইনি প্রক্রিয়ায় হাত ধরে—এ জমি যদি কৃষকদের ফেরতও দেওয়া হয়—তারা তো সেখানে চাষ করতে পারবে না কারণ চাষের জমি তো ইতিমধ্যে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তায় জমাট হয়ে গেছে। সিঙ্গুরে তাঁর টাটা-বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা বলি হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণের জন্য মমতা ব্যানার্জীর কি কোন প্রকল্প আছে? একবার টুপি ঝাড়লেই দশ লাখ লোকের কাজ—তিনি কীভাবেই বা সেটা করে দেখাবেন? ক্লোজার ও লকআউটের (তাদের দীর্ঘ শাসনকালে নির্লিপ্ত বামফ্রন্ট সরকারের নীরব প্রশ্রয়ে ঘটা) ফলে একের পর এক কাজ হারানো শিল্প শ্রমিকরা কাজ ফেরত পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান। নতুন নতুন কারখানা কোথায় গড়ে উঠছে? শিল্পের জন্য জমি দখলের লাগাতার প্রতিযোগিতার মুখে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তিনি যাদের খোশামোদ করছেন, তাদের দাবির সামনে অচিরেই তাঁকে মাথা নত করতে হবে।

তিনি যে তাঁর মন্ত্রীসভায় ফিকির (এফ আই সি সি আই) মুখ্য কর্মকর্তা অমিত মিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা নিছক কাকতালীয় নয়। কিন্তু প্রায় দু লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা

সমেত (যেটা উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন—যাদের অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের ফলে এই টাকার বেশী অংশটাই কলকাতার মহাকরণ ও জেলা সদরগুলোর অলস কর্মচারী, স্কুল কলেজের গরহাজির শিক্ষক এবং সরকারি হাসপাতালের অযোগ্য ডাক্তারদের বেতনে ভর্তুকি দিতেই খরচ হয়েছে) পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা তাকে তিনি সামাল দেবেন কেমন করে? যতক্ষণ কেন্দ্রে এক বন্ধুভাবাপন্ন সরকার রয়েছে ততক্ষণ সেখান থেকে জুতসই আর্থিক প্যাকেজ পাওয়াটা নিশ্চিত হলেও—চলতি কাঠামোয় এই আর্থিক সাহায্য আবারও সেই একই পুরনো দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং তৃণমূল জমানার গুচ্ছের নতুন রাজনীতিবিদ ও তাদের চেলা-চামুণ্ডাদের হৃষ্টপুষ্ট করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা। তাদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলোতে তো ইতিমধ্যেই এমন অভিজ্ঞতা উঠে আসতে শুরু করেছে।

নতুন করে নির্বাচিত যে কোন শাসক দল ক্ষমতায় এসেই পরিবর্তন ঘটানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে স্রেফ এক পা পিছু হটে নির্বাচন পরবর্তী প্রত্যাবর্তনের নরম গদীতে আসীন হয়ে যান—ফিরে আসে আত্মম্ভরিতার পুরনো যত অভ্যাস, প্রতিবাদ দমন করার জন্য পুলিশ নামানো ও সেই একই পক্ষপাতদুষ্ট ও নিপীড়নকারী ব্যবস্থাসমূহ। বিশ্বায়নের নয়া উদারনৈতিক বিধিব্যবস্থায় এইসব অভ্যাস বৈধতা লাভ করে—যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার ধান্দায় ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষণ হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং চিকিৎসা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সর্বজনীন প্রয়োজনের থেকেও তাকে বড় করে দেখানো হয়। সর্বসাধারণের এই দাবিগুলো মেটানোর জন্য মমতা ব্যানার্জীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বাঁধা পড়ার কারণে, তাঁর সরকারকে একেবারে উল্টোমুখে ঘুরে যেতেই হবে এবং তার পূর্বসূরী বামফ্রন্টের অনুসৃত পথ বেয়ে হাঁটতেই হবে। সেই ভ্রমণপথকে তাই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা দরকার। সর্বাগ্রে আমি সি পি আই (এম)-এর ওপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত করব কেন না বিগত তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তার নেতৃত্বের ভূমিকা এবং বর্তমানে লোকসভায় ও জাতীয় রাজনীতিতে ছোট বিরোধী দল হিসেবে তার ভূমিকার নিরিখে তাকেই সংসদীয় বামদের প্রধান কণ্ঠস্বর বলে বিবেচনা করা হয়।

পচনের শুরু

অধিকাংশ ভাষ্যকারই সি পি আই (এম)-এর পরাজয়ের কারণ হিসেবে ২০০৬-০৭-এ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম পরিস্থিতিতে তার আত্মঘাতী ভূমিকাকেই চিহ্নিত করেন এবং তদ্‌পরবর্তী প্রথমে পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পরে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রার্থীদের ধরাশায়ী হওয়ার মধ্যেই তার পতনের লক্ষণগুলো দেখতে পান। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁদের মতে সি পি আই (এম) শাসনের কেবলমাত্র এই পর্বেই (২০০৬-১১) সে সাংঘাতিক ভুলগুলো করে ফেলে—যা তাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমার যুক্তিতে তার বিপর্যয়ের শিকড় এই পর্বের বহু আগের সময়-কালের মধ্যেই নিহিত রয়েছে—সময়টা সন্ধিগ্ধ চাষীদের দিয়ে জোর করে বহুজাতিক-পোষিত শিল্পায়নকে গলাধঃকরণের জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভয়ঙ্কর উদ্যোগ শুরুর বহু আগেই। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম ছিল উটের পিঠে

শেষ খড়কুটো। নানা দিক থেকে সি পি আই (এম) শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বছর ধরে পুঞ্জীভূত হতে থাকা জনরোষ ও হতাশা এই দুই ঘটনায় বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে, বামফ্রন্ট শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের গুঞ্জন তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্বনিত হতে শুরু করেছিল—যদিও তার যৎসামান্যই প্রচারে এসেছিল ও খুব কম এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে একটি বিষয় হল মানবাধিকার। যদিও সি পি আই (এম) চালিত সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল (যাদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন তাদের পুরনো শত্রু, নকশালপন্থীরা) কিন্তু সে তারই দ্বারা নিয়োজিত দুই কমিশন—শর্মা-সরকার কমিশন ও হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনের রায়ে ১৯৭০ থেকে জরুরী অবস্থার সময় পর্যন্ত নির্যাতন চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত কুখ্যাত পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দেওয়া ও পদ থেকে অপসারণের কোন উদ্যোগ নেয়নি। পুলিশ-প্রশাসনকে সংস্কার করার জন্য কমিশনগুলোর সুপারিশকে কার্যকর করার বিপরীতে একই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (যা ছিল প্রবীণ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অধীনে) পুরনো ব্যবস্থাকেই আরো মজবুত করে এবং জনপ্রিয় প্রতিবাদী বিক্ষোভগুলোকে দমনের জন্য কুখ্যাত অফিসার ও কর্মচারীদেরই মোতায়েন করে।

মরিচঝাঁপি ও তারপর

এর প্রথম দৃষ্টান্ত হল—বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার দু-বছর পর ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া। অতীতে বামেরা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই আশ্বাস পেয়ে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার (পূর্বে যাদের কংগ্রেস সরকার তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দিয়েছিল) সুন্দরবনে বসবাসের জন্য এসে হাজির হয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ডিগবাজি খেয়ে সি পি আই (এম) চালিত বাম সরকার প্রত্যাঘাত চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে ও জোর করে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু পরিবার পুলিশের নাগাল এড়াতে সক্ষম হয় এবং সুন্দরবনের গহন অরণ্যের মধ্যে মরিচঝাঁপিতে এসে পৌঁছায়। সেখানে তারা জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদ শুরু করে। বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধে অরণ্য আইনের মত সরকারি আইন লঙঘন ও বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগ আনে! ১৯৭৯-র মে মাসে এইসব উদ্বাস্তুদের গায়ের জোরে বিতাড়নের জন্য পুলিশী অভিযান শুরু করা হয়—যার ফলে বেশ কিছু নারী পুরুষ ও শিশুহত্যার ঘটনা ঘটে, অভিযোগ ওঠে অনেকের লাশ স্তূপীকৃত করে নদীর জলে ফেলে দেওয়ার। দীর্ঘদিন চেপে রাখা এই কাহিনী (দি জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা-১, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯-এ প্রকাশিত) রস ম্যালিকের অতি তথ্যসমৃদ্ধ রচনা—"রিফিউজি রিসেটলমেন্ট ইন ফরেস্ট রিজার্ভস ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিসি রিভার্সাল এ্যাণ্ড দি মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার"-এ (সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ পশ্চিমবঙ্গ নীতির উল্টোযাত্রা এবং মরিচঝাঁপি গণহত্যা) উন্মোচিত হয়েছে। মরিচঝাঁপি পরবর্তী বছরগুলো জনগণের যে কোন অসন্তোষকে দমন করতে উদ্যত হত্যা-পিপাসু এক শক্তি হিসেবে পুলিশ বাহিনীর পুনরুদ্ভবকে প্রত্যক্ষ করেছে। শুধুমাত্র ১৯৮০-৮১

এই দুই বছরেই পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে কমপক্ষে ২৪৮টি, যার ফলে নারী-শিশু সমেত ৬২ জনের মৃত্যু ঘটেছে। ঐ একই সময়ে পুলিশ লকআপে ও জেলখানায় বিচারাধীন বন্দীমৃত্যুর সংখ্যা যত উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা জরুরী অবস্থার দিনগুলোকেই মনে করিয়ে দেয়। বাম সরকারের তৃতীয় দফা শাসনকালের শেষ পর্বে এটা এমনই মাত্রায় গিয়ে পৌঁছায় যে ১৯৯২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডি কে বসুকে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং ব্যাপারটিকে ভৎর্সনা জানিয়ে পুলিশ হেফাজতে অত্যাচার ও মৃত্যুকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে কঠোরভাবে নিয়মকানুন মেনে চলতে বলতে হয়। কিন্তু মানবাধিকারের প্রশ্নে সি পি আই (এম) -এর স্বভাবসিদ্ধ অসংবেদনশীলতা থেকে সরকার তার মর্ষকামী পুলিশবাহিনীকে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করে এবং হাইকোর্টের সুপারিশগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। ১৯৯৬-তে সর্বোচ্চ আদালত বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলার রায়ে প্রধানত বিচারপতি বসুর মতগুলোকেই সমর্থন জানায় এবং গ্রেপ্তার, জিজ্ঞাসাবাদ চালানো এবং তদন্তের ক্ষেত্রে ১১ দফা পালনীয় কর্তব্যকে তুলে ধরে।

কৃষিভিত্তিক নির্বাচন ক্ষেত্রগুলো

মানবাধিকারের প্রশ্নে তার নির্যাতনকারী রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সি পি আই (এম) কিন্তু তার শাসনকালের প্রথম পাঁচ বছর কৃষি অঞ্চলগুলোতে কৃষকদের জমি বিতরণ, বর্গাদারদের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ, দিনমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি ও পঞ্চায়েত মারফত ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু ১৯৮০-র দশকের গোড়ার মধ্যে সে এক কানা গলিতে গিয়ে পৌঁছায়। জোতগুলোর আয়তন খুব ছোট হওয়ার ফলে (জমির পুনর্বণ্টনের ফলে কৃষকদের হাতে এসে যা পৌঁছায়) আয় যে অপ্রতুল হয়ে পড়ছে তা আন্দাজ করায় তার ব্যর্থতা; এইসমস্ত কৃষকদের কাছে কৃষি উপকরণ ও পরিকাঠামো যোগানোর জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার অনীহা; গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উপযোগী কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপনে তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব গ্রামীণ অর্থনীতিকে এক স্থিতাবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। এটা নয় যে সি পি আই (এম) নেতৃত্ব আসন্ন সংকটের লক্ষণগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। ১৯৮২-তে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ঐ বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ভক্তিভূষণ মণ্ডল সতর্ক করে বলেছিলেন যে ছোট ছোট জমির মালিকরা (জমি পুনর্বণ্টনের ফলে যারা জমি পেয়েছেন) তাদের চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য যত ব্যয় করছেন তার তুলনায় উৎপাদন থেকে তাদের আয় কম হওয়ায় সংকটের মুখে পড়ছেন। তিনি উপলব্ধি করেন, যদি তাদের আয়ের সাথে পরিপূরক হিসেবে কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে তাদের টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠবে। তাঁর সতর্কবাণীতে সি পি আই (এম) নেতৃত্ব কর্ণপাত করেনি, আর এই বিচ্ছিন্নতার মূল্য হিসেবে পরবর্তী দুই বা তিন দশকের মধ্যে গ্রামীণ জনসংখ্যার বিশাল অংশ ক্রমাগত দারিদ্রের কবলে পড়ে যেতে থাকেন।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা

দ্বিতীয় কৃতিত্ব হিসেবে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সত্যিই সি পি আই (এম)-কে গ্রাম থেকে জন সমর্থন এনে দেয়—যেখানে সে-ই সর্বপ্রথম নীচুতলায় নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণের এবং

আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের নিয়মকানুন ও বাধাকে অতিক্রম করার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে প্রতিশ্রুতি হাজির করে। কিন্তু এই পঞ্চায়েত অনতিকাল পরেই সি পি আই (এম) এবং বামফ্রন্টের অন্যান্য পার্টির স্থানীয় নেতা ও মোড়লদের আধিপত্যাধীন সংস্থায় অধঃপতিত হয়। এই সমস্ত লোকজনেরা গ্রামবাসীদের সামাজিক কল্যাণের জন্য বরাদ্দ সরকারি তহবিল পাচার করে পার্টি অফিস ও নিজেদের বাড়ী তৈরীর কাজে লাগাতে থাকে (চারপাশের দারুণ দারিদ্রের মাঝে এইসব আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠারা নির্বাচনগুলোর প্রাক্কালে বাম বিরোধী আলোড়নের সময় খুব বোধ্য কারণেই জনরোষের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়)। আর এই সমস্ত প্রবণতাগুলো বামফ্রন্ট শাসনের ২০০০-১১ পর্বে হঠাৎই এসে হাজির হয়নি। পঞ্চায়েতগুলো যে পদ্ধতিতে গঠন করা হয়েছিল তার মধ্যেই দুর্নীতির মূল নিহিত ছিল। ১৯৭৮-এর জুন মাসে প্রথম পঞ্চায়েত ভোটের সময় সি পি আই (এম) এবং তার মিত্রদের বেছে নেওয়া প্রার্থীদের মধ্য থেকে যারা নির্বাচিত হয় তাদের অধিকাংশই এসেছিল সম্পন্ন মধ্যবিত্ত চাষী (৫০.৭ শতাংশ) ও স্কুল শিক্ষকদের (১৪ শতাংশ) থেকে আর গ্রামীণ গরিব (যাদের বামেদের প্রধান ভিত্তি বলে দাবি করা হয়) ও ভাগচাষীদের মধ্য থেকে এসেছিল মাত্র ১.৮ শতাংশ এবং কৃষি শ্রমিকরা ছিল ৪.৮ শতাংশ। পঞ্চায়েতগুলোর এমন সামঞ্জস্যহীন গঠন বৈশিষ্ট্য হলে প্রধানরা যে দ্রুতই দাপট আর দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ গরিবদের শোষণের পাণ্ডায় পরিণত হবে—তাতে আর আশ্চর্য কী! এক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারের উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিচালনায় এ হেন বিকৃতির কথা অজানা ছিল না। ১৯৮২ সালেই তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (আর এস পি দলের প্রতিনিধি) রাজ্য সচিবালয় থেকে এক বিবৃতিতে স্বীকার করেন যে পঞ্চায়েত সদস্যদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি আরো বলেন, ৩২৪২টি পঞ্চায়েতের মধ্যে কেবলমাত্র ১১৬০টি পঞ্চায়েত অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এর পরবর্তীকালে বাম-পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলো চিহ্নিত হয়েছে নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে আরো অধঃপতিত বলে, যার মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিল সি পি আই (এম) নিয়ন্ত্রিত।

শিল্পক্ষেত্র

এবার শিল্পক্ষেত্রের দিকে তাকানো যাক। সি পি আই (এম)-এর কর্মসূচীতে প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হিসেবে শিল্পীয় সর্বহারাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এতগুলো বছর জুড়ে যখন হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়ে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বামফ্রন্ট সরকার তখন কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শক থেকে গেছে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলো যখন সমবায় গঠন করে কারখানাগুলো চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে তখন কড়ে আঙ্গুল দিয়ে তাকে সাহায্য করতেও অস্বীকার করেছে। সরকারের শিল্পনীতি পুরনো কারখানাগুলো বন্ধ হতে ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের রাস্তাকে সুগম করেছে এবং শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে প্রবেশের পথ করে দিয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের কোন সুযোগ দেয়নি। আর এই শিল্পনীতির জন্য পার্টিকে শ্রমিকরা শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছেন।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের রেকর্ডের দিকে নজর ফেরালে দেখা যাবে, ১৯৮০-র দশক থেকে—যখন শ্রমিকরা অতর্কিত ধর্মঘট না করার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উপদেশকে

মেনে নিচ্ছেন তখন শ্রী বসু মালিকদের ক্লোজার ও লকআউট ঘোষণায় সম্মতি দিচ্ছেন। ১৯৮১-তে যেক্ষেত্রে ৪৩টি ধর্মঘট হয়েছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৮২-তে ধর্মঘটের সংখ্যা কমে দাঁড়াচ্ছে ২৯টিতে। অথচ ঐ একই সময়কালে ৫৪টি কারখানায় লকআউট ঘোষিত হয়েছে যার ফলে ৫৩,০০০ শ্রমিকের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর শিল্পমালিকেরা ১৩টি কারখানায় ক্লোজার ঘোষণা করে ১২,৩০০ শ্রমিককে পথে বসিয়ে দিয়েছে (দেবাশীষ ভট্টাচার্য, বামপন্থীরা মহাকরণের মন্ত্রী হয়ে যা করছেন, কলকাতা ১৯৮৩)। এই প্রবণতা আজও একই রয়ে গেছে। ২০০৫-এর লেবার ব্যুরোর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা যেখানে ২৬ সেখানে লকআউটের সংখ্যা ১৮২—যা থেকে সি পি আই (এম) জমানায় ট্রেড ইউনিয়ন চুক্তির ক্ষেত্রে মাঠ যে অসমান ছিল সেটা বোঝা যায়। সি পি আই (এম)-এর বর্তমানে যে বহুজাতিক সালিমের দিকে ঝোঁক কিংবা ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের মহারথী টাটা ও জিন্দালদের দিকে ঝোঁক দেখা যায় তার মূলে কিন্তু রয়েছে ১৯৮০-র দশকে গৃহীত তাদের শিল্পনীতি।

এই বছরগুলোতে যখন গ্রামীণ জনগণের ক্রমেই মোহভঙ্গ হচ্ছে, শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার বোধ জেগে উঠছে এবং শহুরে গরিব ও মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে বেশী বেশী বিচ্ছিন্নতা ঘটছে, সি পি আই (এম)-এর আত্মতৃপ্ত নেতৃত্ব তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে দলীয় সদর দপ্তরে বসে খবরের কাগজে প্রকাশিত সতর্কতার সঙ্কেতগুলো সহ দলেরই কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বামপন্থী পর্যবেক্ষক ও অর্থনীতিবিদদের (সরকারি সি পি আই (এম)-এর বৃত্তের বাইরে থেকে) উচ্চারিত আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণীগুলোর প্রতি (যা প্রায়ই ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি-র পৃষ্ঠায় প্রকাশ হত) পুরোপুরি নির্লিপ্ত থাকতেন। অবজ্ঞার ঢঙে তাঁরা খবরের কাগজে প্রকাশিত তথ্যগুলোকে 'বুর্জোয়া অপপ্রচার' বলে খারিজ করে দিতেন। পার্টির এক বর্ষীয়ান নেতা বিনয় চৌধুরী যে ঝাঁঝালো সমালোচনা করেছিলেন সেটিতে অন্তত তাঁরা কর্ণপাত করতে পারতেন (প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মন্ত্রী থাকাকালীন তিনিই ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর সূত্রপাত করেন)। ১৯৯০-এর দশকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পার্টি সংগঠনে 'কন্ট্রাক্টর ও জমি-বাড়ীর প্রোমোটাররা' ছড়ি ঘোরাচ্ছে বলে খোলাখুলি নিন্দা জানান। কিন্তু পার্টি সদর দপ্তরের কর্তারা ভাবলেন, যত দিন পার্টির ভাণ্ডারে নিয়মিত কোটা এসে পৌঁছাবে ততদিন জেলা স্তরের পার্টি দাদাদের দ্বারা ঠিকাদার-প্রমোটারদের কাছ থেকে গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে কমিশন খাওয়ার ব্যাপারটা উপেক্ষা করা যেতে পারে। এইসব অপকর্মকে ঘিরে শহরাঞ্চলে যে গণঅসন্তোষ তাকে আমল না দিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের নেতারা মনে করলেন, তাঁদের সবথেকে বড় প্রভাবক্ষেত্রে—গ্রামের কৃষকরা চিরকাল বাধ্য আজ্ঞাবহ সমর্থক হয়ে তাঁদের প্রভাবকে অটুট রাখবে। এ জন্য ৩০ বছর আগে সূচনা হওয়া (ভূমি) সংস্কারের কথা বারবার তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হল ও তার জন্য কৃতজ্ঞতা দাবি করা হল।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, কৃষিতে সংস্কারের এইসব পদক্ষেপ ১৯৮০-র দশকে এসে আধসারা পদক্ষেপে পর্যবসিত হয়েছে, ১৯৯০-এর দশকে এসে আর্থিক গতিহীনতায় থমকে গেছে এবং ২০০০-এর দশকে এসে সি পি আই (এম)-এর কুক্ষিগত চরম দলবাজির হাতিয়ারে অধঃপতিত হয়েছে। যে কর্মসূচীর ইতিহাস বলছে, সূচনায় যে ভূমিসংস্কার গ্রামীণ গরিবদের

একটি প্রজন্মকে ক্ষমতা জুগিয়েছিল সে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের সামনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর কোন কার্যকরী উপায়ই রাখেনি। আর তাই এটা আর আশ্চর্য নয় যে বাংলার গ্রামের লোকজনেরা আজ সি পি আই (এম)-এর অতীত সাফল্যকে পুঁজি করে টিকে থাকার অভ্যাসকে বিদ্রূপ করে জনপ্রিয় এক পুরনো বাংলা প্রবাদকে তুলে ধরছেন, "কবে পোলাও খেয়েছিলাম, এখনো হাতে তার গন্ধ লেগে আছে"!

মুসলিম নির্বাচনী ক্ষেত্র

সি পি আই (এম)-এর আর এক চিরাচরিত নির্বাচকমণ্ডলী সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ও এবার তাকে পরিত্যাগ করেছে। তথাপি, বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সবসময়ই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে সবথেকে নিরাপদ স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে, যেখানে ২০০২-এ মুসলিম-বিরোধী গুজরাট ধ্বংসলীলার পরও ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয় মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গ এমন এক রাজ্য বলে পরিচিত যেখানে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভবকে সবসময়ই প্রতিহত করা হয়েছে (১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কয়েকটি দৃষ্টান্ত ব্যতীত)। এতদ্‌সত্ত্বেও, মমতা ব্যানার্জী একসময় এন ডি এ সরকারের শরিক ছিলেন এবং সেই সরকার গুজরাটে মুসলিমদের হত্যায় পৌরোহিত্য করেছে—এই কথা স্মরণে রেখেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা সাধারণভাবে তাঁকেই ভোট দিয়েছে। এটা কি তাদের বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলোর প্রতি বামফ্রন্টের যে ঔদাসীন্য—যে তথ্য সাচার কমিটির রিপোর্টেও উঠে এসেছে—তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই এক অভিব্যক্তি? তাঁদের স্বল্পদর্শী রণকৌশল থেকে সি পি আই (এম) নেতারা ভেবেছিলেন মৌলবাদী মোল্লাদের তসলিমা নাসরিনের বইকে নিষিদ্ধ করা ও তাঁকে বহিষ্কার করার দাবি মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা মুসলিম ভোটারদের মন জয় করতে পারবেন। প্রায় একই সময়ে—এ রাজ্যে ব্যবসা চালানো উত্তর ভারতের হিন্দু ব্যবসায়ী ঘরানাগুলোকে সন্তুষ্ট করতে এবং সেখান থেকে সি পি আই (এম)-এর কোষাগারে নিয়মিত অর্থাগমকে নিশ্চিত করতে তাঁরা শিল্পপতি অশোক টোডির পিছনে গোটা প্রশাসনটাকেই দাঁড় করিয়েছিলেন—যে অশোক টোডি সাধারণ এক মুসলিম যুবক রিজওয়ানুর রহমানের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে কিছুতেই সম্মত হয়নি। কলকাতার বড় বড় পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে রিজাওয়ানুরকে হেনস্তা করার ও জোর করে তার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ ওঠে। ঠিক তার পরপরই, ২০০৭-এ রেল লাইনের ওপর রিজাওয়ানুরকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তদন্তে জানা যায় পুলিশ অফিসার ও টোডি পরিবার তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দিতে বামফ্রন্ট সরকারের নারাজ হওয়াটা শুধু রিজওয়ানুরের পরিবারকেই ক্ষুব্ধ করে তোলে না (যারা তাকে খুন করা হয়েছে বলে মনে করে) বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বড় অংশের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে সি পি আই (এম) হিন্দু শিল্পপতি টোডিকেই রক্ষা করছে। এই ভাবাবেগকেই মমতা ব্যানার্জী কাজে লাগান এবং রিজাওয়ানুরের ভাই রুকবানুরকে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান।

প্রশাসন পার্টির হাতে তুলে নেওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সরকার পরিচালনার প্রশ্নে সবার প্রত্যাশা ছিল, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র তৈরীর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটা নিখাদ সমাজগণতন্ত্রী দল হিসেবে সি পি আই (এম) সংসদীয়

ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ায় অন্তত এই ব্যবস্থার দুটি নিয়মকে মেনে চলবে। কিন্তু যে কোন প্রকারে ক্ষমতায় টিকে থাকার সংকীর্ণ তাগিদ থেকে কলকাতায় আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে তার সদর দপ্তরটিকে সংবিধান বহির্ভূত শাসন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা এবং জেলা ও গ্রামস্তরের পার্টি কর্তাদের দৈনন্দিন প্রশাসনের লাগাম হাতে তুলে নেওয়া ও তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আমলাদের প্রতিস্থাপন করায় উৎসাহ দানের মধ্য দিয়ে পার্টির প্রথম বিচ্যুতিটি ঘটে যায়। এ প্রসঙ্গে বাম জমানায় দায়িত্ব সামলেছেন এমন এক শীর্ষস্থানীয় আমলা কল্যাণী চৌধুরী তাঁর বই ঃ হোয়েন দি পেণ্ডুলাম স্টপস ঃ ডেথ অফ বেঙ্গল ব্যুরোক্রেসী (কলকাতা ঃ নচিকেতা প্রকাশনী)-তে প্রশাসন যন্ত্রকে ধারাবাহিক ও পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে তোলার অন্তর্দৃশ্যকে চমৎকারভাবে হাজির করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় সি পি আই (এম) নেতা ও তাদের প্রিয়পাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা মেডিকেল কলেজের মত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনকে কব্জা করা এবং নিজেদের পেটোয়া লোকদের (যারা প্রায়ই পুরোপুরি অযোগ্য বলে প্রমাণিত) বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা ও এইসব প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনায় নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ১৯৯০ সাল নাগাদ, আমি কলকাতায় এসে রোগীদের মুখ থেকে এমন অভিযোগ শুনেছিলাম যে কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতে গেলে সি পি আই (এম) চালিত কর্মচারী ইউনিয়নকে তৈলমর্দন করতে হয়। আমি কলকাতা ও দিল্লী—দু জায়গাতেই আমার পরিচিত সি পি আই (এম) বন্ধুদের এই বিপজ্জনক ঝোঁক সম্পর্কে জানাই। কিন্তু তারা এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আমার কথা খারিজ করে দেন।

বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে চলা একটা সমাজগণতন্ত্রী পার্টির দ্বিতীয় দায়টা হল, গণতান্ত্রিক পরিসর সহ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রতি সহিষ্ণুতা বজায় রাখা। কিন্তু সি পি আই (এম) তার শাসনকালে নিজেদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়ে এই পরিসরটিকে সংকুচিত করে ফেলে। ১৯৯০-২০০০-এর মধ্যে পরপর অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনগুলোর সময় অভিযোগ ওঠে যে তার দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকা ভোট সংখ্যাকে (যা তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়া থেকে আগাম আঁচ করে) অন্যভাবে পূরণের জন্য সে রিগিংয়ের আশ্রয় নিচ্ছে (প্রকৃত ভোটারদের দলের মাস্‌লম্যানরা ভোট দানে বাধা দেয় এবং ভোটারদের বদলে পার্টি-নিযুক্ত প্রিসাইডিং অফিসাররাই শাসক দলের প্রার্থীর পক্ষে ব্যালট পেপারে ছাপ মেরে দেয়)। এই ধরনের আতঙ্ক যে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা মেনে নিয়েও (কলকাতায় আমার বন্ধুরাও তঁদের অনুরূপ আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন—যেখানে গত চারটি বিধানসভা নির্বাচনেই তাঁদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়) আমি মনে করি সি পি আই (এম) শুধুমাত্র রিগিংয়ের জোরেই ভোটে জেতেনি। তখনও সে তার অনুগত সমর্থকবাহিনীর ওপর নির্ভর করার পাশাপাশি বিকল্পের অভাবে নিরুপায় হয়ে থেকে যাওয়া গ্রামীণ নির্বাচকদের অর্ধসন্তুষ্ট অংশটিকে নানা কৌশলে পাশে রাখার আশায় ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর উপর্যুপরি নির্বাচনী সাফল্য (এমনকি ১৯৯০-এর দশকে তার কার্যকলাপের ফলে জনগণের মোহভঙ্গ সত্ত্বেও) ছিল বলপ্রয়োগ ও বুঝিয়ে বলা—

এই দুই দিকের হিসেব কষা সংমিশ্রণের ফল। ২০১১-র নির্বাচনে এই জোড়া কৌশল দুটি কারণে কাজ করেনি। প্রথমত, সি পি আই (এম)-এর বলপ্রয়োগের যে জারিজুরি তাকে নির্বাচন কমিশন আটকে দেয়, যার সাথে আবার যুক্ত হয় ভোটারদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। দ্বিতীয়ত, সি পি আই (এম)-এর বুঝিয়ে বলার আবেদনে এবার গ্রামীণ ভোটাররা সাড়া দেননি কারণ ইতিমধ্যে তাঁরা তৃণমূলকে বিকল্প হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন।

সি পি আই (এম)-এর ভবিষ্যৎ

সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিংবা রাজ্য নেতৃত্ব কেউই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাদের নির্মূল হওয়ার কারণগুলোকে গভীরভাবে অন্বেষণ করার কোন লক্ষণ দেখাননি। পার্টির কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য তাঁদের কোন সদিচ্ছাও চোখে পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং পার্টির ডাকসাইটে রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু গম্ভীর নীরবতার আশ্রয় নিয়েছেন, আর যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে বিগত লোকসভা নির্বাচনে ও সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে দলীয় পরাজয় ঘটেছে তার জন্য পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত নিজের কোন দায় স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন। এটা স্পষ্ট যে চূড়ান্ত মর্যাদাহানি সত্ত্বেও পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কোন ইচ্ছাই নেতৃত্বের নেই। আর পশ্চিমবঙ্গে তাদের ক্যাডারদের মধ্যে যারা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী (সেই সব পেশীবাজ যারা হার্মাদ বলে আখ্যায়িত) হিসেবে কাজ করত তারা নতুন শাসকদের শরণাপন্ন হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশাজীবীদের মধ্যকার হাওয়া মোরগ যারা তারা তো ইতিমধ্যেই তৃণমূল অফিসে গিয়ে মৌমাছির মত লাইন লাগাতে শুরু করেছে। আর ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠনগুলোর মধ্যকার মুষ্টিমেয় মতাদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ পুরনো কর্মীরা এমনই হীনমন্যতায় ভুগছেন যে তাঁদের দ্বারা পার্টিকে আবার জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

শেষোক্তরা তাদের পার্টি সংগঠনে তেমন কোন সম্ভাবনাময় নেতাদের খুঁজে পাচ্ছেন না যাঁরা নয়াদিল্লীতে বসে এখনও পার্টি চালানো শীর্ষ আমলাসুলভ নেতাদের এবং ৩০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা থেকে ছিটকে যাওয়া ১৯৬০-এর দশকের ছাত্রনেতাদের স্থান গ্রহণ করতে পারেন। যে পার্টি ১৯৬৪-তে শ্রমিক-কৃষকদের সেবা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ঐ নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর দিকেই বন্দুক উঁচিয়ে ধরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাবু-প্রাধান্যের সংগঠনে গিয়ে যে পার্টি শেষ হয়—সেই পার্টির অধঃপতন দেখে এইসব সৎকর্মীরা শীঘ্রই বসে যাওয়া বা রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাবেন। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, সি পি আই (এম)-এর যে সব নেতারা একগুঁয়ের মত অতীতের ভুলগুলোকে মেনে নিতে এবং সংগঠনকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধীদের থেকে মুক্ত করতে নারাজ সেইসব নেতারাই যেহেতু গদিতে থেকে যাবেন, তাই আগামী বছরগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দল অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। পার্টির জাতীয় নেতৃত্বকে আরো মৌলিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে—নির্বাচনকেন্দ্রীক জনপ্রিয়তাবাদ ও সুবিধাবাদের ইঁদুর দৌড়ে মত্ত থাকার ফলে নৈতিকতার যে ক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে তাকে প্রতিহত করবেন কী উপায়ে? যে গণতন্ত্রবিরোধী কাজের ধারা তাকে

স্তালিনপন্থী কর্তৃত্ববাদের পথে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার সাথে সমাজগণতন্ত্রী একটা দল হিসেবে তার ভূমিকাকে সে মেলাবে কীভাবে?

এ থেকেই সাধারণভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে বামেদের ভবিষ্যৎ কী সেই ভাবনা এসে পড়ে। সি পি আই (এম) এবং বাম মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্যকরণ করতে সময়ের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকাকালীন সি পি আই (এম)-এর রেকর্ড থেকে যেটা ভেসে আসে তা হল পার্টি কৃষক-শ্রমিকের অধিকার রক্ষার তার পূর্বেকার দায়বদ্ধতা থেকে ক্রমাগত বিপথে চলে গেছে এবং অবশেষে তাদেরকে অতিবৃহৎ শিল্পপতি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বেদীমূলে বলিদান করেছে; গরিবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য কুখ্যাত পুলিশ বাহিনীকে চাঙ্গা করার মাধ্যমে সে নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। জাতীয় স্তরেও অকিঞ্চিৎকর এক তৃতীয় মোর্চা গড়ে তোলার অজুহাতে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের সঙ্গে মিত্রতা করতে গিয়ে মতাদর্শগত নীতিসমূহের প্রতি খুব সামান্যই মনোযোগী হয়েছে। সুতরাং সি পি আই (এম) বাম দল হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। তাকে বৃহত্তর কোন দায়বদ্ধতা শূন্য অপর যে কোন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে (কেবলমাত্র ক্ষমতায় আসার জন্য যারা কেবল নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থ নিয়ে চলে সেই সব জাত-পাত ভিত্তিক অথবা আঞ্চলিক দলের মত) বিবেচনা করা যেতে পারে।

বামেদের কাছে যা তাৎপর্যময়

ভারতীয় বামেদের মধ্যকার বিভিন্ন শক্তির পুনর্বিন্যাস খুবই জরুরী। সি পি আই (এম)-এর আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং কৃষক, শিল্পীয় শ্রমিক ও সমাজের অন্যান্য বঞ্চিত অংশগুলোর সাথে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলোর পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে তাদের মধ্যে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই এই কাজটি শুরু করা যেতে পারে। সংসদীয় বাম দলগুলো (উদাহরণস্বরূপ বর্তমান বামফ্রন্টের মধ্যকার সি পি আই (এম)-এর 'বড়দাদা' সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ছোট শরিকরা) এবং অসংসদীয় আন্দোলনের শক্তিগুলো—উভয়কে নিয়েই নয়া ভারতীয় বামেদের—যদি এভাবে নামকরণ করা হয়—ব্যাপক এক কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। এই কাঠামো প্রধান ধারার রাজনৈতিক আঙ্গিনার বাইরে বিভিন্ন জনপ্রিয় গণআন্দোলনে (যেমন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, পসকো বিরোধী আন্দোলন) সামিল হতে পারে, নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের নানা গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন বাড়িয়ে দিতে পারে, মাওবাদীদের সাথে আলোচনা শুরু করতে পারে এবং এই সমস্ত শক্তি নিয়ে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিকল্প এক রণনীতি রচনা করতে পারে। সি পি আই (এম)-এর সদস্য ও দরদীদের তালিকার শোভাবর্ধনের দ্বারা যাঁরা দলটিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়ে থাকেন সেইসব বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদরা কি তাঁদের দলকে তাঁদের বিশ্বাস করা মতাদর্শের একমাত্র রক্ষক বলে চিহ্নিত করা থেকে বিরত হবেন না এবং তার বদলে নতুন এই বাম আন্দোলনের সমর্থনে তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করবেন না?

(ই পি ডব্লিউ, ৪ জুন ২০১১ সংখ্যা থেকে)

বামেদের পড়ন্ত দশা

।। প্রভাত পটনায়েক।।

যে প্রক্রিয়াটিই সি পি আই (এম)-এর পড়ন্ত দশাকে ডেকে এনেছে সেটিকেই অনেকে তার পুনরুজ্জীবনের দাওয়াই হিসেবে তুলে ধরছেন—পরিহাসের বিষয় এটাই। যে প্রক্রিয়া এই ক্ষয়ের কারণ তাকে আমি "গতানুগতিক অভ্যাসবাদের" প্রক্রিয়া বলে আখ্যা দেব। এর দ্বারা আমি এমন এক রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা বোঝাতে চাই যা পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পের শিক্ষাকে মেনে চলে না। অবশ্য বিপ্লবী পরিস্থিতির পেকে ওঠাটা কেবল বিক্ষিপ্তভাবেই ঘটে থাকে। আর তাই দীর্ঘসময় জুড়ে যে রাজনৈতিক অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয় তাকে মেঠো ও পথচারীর তত্ত্বের মত মনে হয়, যা বি টি রণদিভের ভাষায় "রাজনীতির ছোট্ট পরিবর্তন"। কিন্তু একটি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এমনকি এই "রাজনীতির ছোট্ট পরিবর্তন"টিকেও অতি অবশ্যই পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পের তত্ত্বের অধীনে রাখতে হবে। আর এটা যদি না হয় তাহলে আমরা পাব নিছকই শুধু "রাজনীতির ছোট্ট পরিবর্তন" অর্থাৎ গতানুগতিক অভ্যাসবাদ। গতানুগতিক অভ্যাসবাদের এই প্রক্রিয়াই শেষবিচারে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরাজয়ের জন্যও দায়ী—যা কোন বাম দরদীর কাছে শুধু নির্বাচনে পরাজয়ের থেকেও অনেক বেশী উদ্বেগের। কারণ একটি নির্বাচনে পরাজয় থেকে পরের নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু গতানুগতিক অভ্যাসবাদের প্রক্রিয়াটিকে পাল্টে ফেলা তার চেয়ে ঢের কঠিন। কারণ গতানুগতিক অভ্যাসবাদ কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন এটির উৎস সম্পর্কে সচেতনতা। এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আলোচনাতেই আমি এখানে নিবদ্ধ থাকব। নতুন করে উঠে দাঁড়ানোর মরিয়া প্রচেষ্টায় সজ্ঞানে আরও অভিজ্ঞতা সর্বস্ব হয়ে ওঠাকে রোধ করতে এটা হয়ত সহায়ক হতে পারে।

মেঠো, অভিজ্ঞতাবাদী, প্রতিদিনের রাজনীতিতে "হাত ময়লা করে" না বলেই কমিউনিস্ট পার্টি যে অন্যদের থেকে পৃথক তা নয় (সেটা বন্ধ্যা উগ্র বামপন্থা হয়ে দাঁড়ায়), বরং এই স্তরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রক্রিয়াটাও স্তরে স্তরে গড়ে তোলা পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পের আওতাধীন থাকে—যাকে লুক্যাক্স (১৯২৪) বলেছেন, "বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করা"। "বিপ্লবের বাস্তবায়নের" দ্বারা প্রাণিত হয়ে ওঠার অর্থ বিপ্লবটা হাতের কাছেই এসে পড়েছে—এমনটা বিশ্বাস করা নয়; এর অর্থ কেবল এটাই যে, "রাজনীতির ছোট্ট পরিবর্তনের" কাজে এমনভাবে লিপ্ত হতে হবে যাতে প্রাত্যহিক রাজনীতি ও পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পের মধ্যে সামগ্রিক ব্যবধানটা বজায় রাখার এক তত্ত্বের ওপর তা ভিত্তি করে থাকে। পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার সামগ্রিক প্রকল্পের সাথে "এখানে এবং এখনই"-কে সমন্বিত করার এই যে তত্ত্ব তাকে বাদ দিয়ে যদি "এখানে এবং এখনই"-র তত্ত্বের মধ্যে আটকে থাকা হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন অভিজ্ঞতা-সর্বস্বতায় নিমজ্জিত হবে।

গতানুগতিক অভ্যাসবাদ থেকে জন্ম নেওয়া চারটি প্রবণতা

আমাদের রাজনৈতিক অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গতানুগতিক অভ্যাসবাদ অন্তত চার ধরনের প্রবণতার জন্ম দেয় ঃ প্রথম, এর থেকে পার্টি সম্পর্কে বিরোধীরা যে "পাপগুলো" আরোপ করে থাকে তারও এমন কি পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নিজস্ব আত্মসমালোচনামূলক দলিল-দস্তাবেজেও পার্টির নিজেকে যা আক্রান্ত করেছে বলে উল্লেখ করা হয়—স্থানীয় স্তরে সেই উচ্চাকাঙ্খা, "নবাবির হাবভাব" আমলাতান্ত্রিকতা ও হামবড়াভাব ইত্যাদিগুলো বেড়ে চলারও জন্ম হয়। দ্বিতীয়, এর থেকে ক্ষয়ক্ষতিকে বিপ্লবী অনুশীলনের অঙ্গ হিসেবে দেখে সামনে এগিয়ে চলার পরিবর্তে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য পরিস্থিতির সাথে "মানিয়ে নেওয়ার" ঝোঁক মাথাচাড়া দেয়। এর ফলে আবার যে বুনিয়াদী শ্রেণীগুলো অর্থাৎ, শ্রমিক, কৃষক, কৃষিমজুর ও গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বার্থে পার্টির সংগ্রাম করার কথা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ার জন্ম হয়। "পার্টির স্বার্থকে" বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করে দেখা হয় এবং "পার্টির স্বার্থ" রক্ষায় আশু এবং কতকগুলো "এখানে এবং এখনই" পদক্ষেপের চিন্তা করা হয় ও আশ্রয় নেওয়া হয়; পরিণতিতে বুনিয়াদী শ্রেণীগুলো থেকে বিচ্ছিন্নতা আরো বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে হরেকরকমের রাজনৈতিক দলের যে পার্থক্য গতানুগতিক অভ্যাসবাদ তা মুছে দিতে থাকে।

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন যাবত এইসব কিছুই চোখে পড়ছে—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর থেকে (বিশেষত কৃষকশ্রেণীর থেকে) সি পি আই (এম)-এর বিচ্ছিন্নতা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের পর নির্বাচনে তার পরাজয় ডেকে এনেছে। কিন্তু গতানুগতিক অভ্যাসবাদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হল এক বুনিয়াদী চরিত্রের যা তাকে আরও গতানুগতিক অভ্যাসবাদের দিকে তাড়িত করে এবং এক দ্বান্দ্বিকতার জন্ম দেয়। আর এই প্রক্রিয়াকে যদি অবাধে চলতে দেওয়া হয় তাহলে তার বাস্তব পরিণতি হিসেবে পার্টি গিয়ে পৌঁছাবে পুঁজিবাদী মতাদর্শের কব্জায় এবং সাম্রাজ্যবাদের ধারণাকে খারিজ করার জায়গায়—যা ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল গঠনের মধ্যেকার মৌলিক ভাঙ্গনের প্রকৃত কারণ। এর ফলে কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে আর সব রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যকার পার্থক্যও কার্যত মুছে যাবে। এই জায়গায় পৌঁছে, কমিউনিস্টরা (অথবা সেই সময় তাদের পছন্দমত সংগঠনের যদি অন্য কোন নামও তারা দেয়) যদি নির্বাচনে জিতেও যায় ও নিজেদের সরকার গঠনও করে, তাতে পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পের কিংবা বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর অবস্থার মৌলিক কোন ফারাক হবে না।

এখানে দুটি সাফাই যথাযথ হবে। প্রথমটি হল ঃ যদিও গতানুগতিক অভ্যাসবাদী হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তবুও সি পি আই (এম) শেষ পরিণতিতে পৌঁছানোর থেকে বেশ দূরেই আছে। এর গতানুগতিক অভ্যাসবাদকে তাই মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখা ঠিক হবে না। সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (ইউ পি এ) থেকে ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তির প্রশ্নে সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনাটা—যার ফলে আশু বিচার থেকে দেখলে "পার্টি স্বার্থের" ক্ষতিই হয় এবং যে জন্য অমর্ত্য সেনের মত পার্টির স্বঘোষিত শুভাকাঙ্খীর সমালোচনারও উদ্রেক হয়েছে—

আপাত বিরোধাত্মক মনে হলেও সেটাই দেখিয়ে দেয়, কী মাত্রায় পার্টি আজও গতানুগতিক অভ্যাসবাদ থেকে মুক্ত। পরমাণু চুক্তির সমস্ত ঘটনাটা পার্টি যথাযথভাবে মোকাবিলা করেছিল কি না সে প্রশ্ন এখানে আসছে না; সব পদক্ষেপ অবশ্যই যথোপযুক্ত ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এমন একটা বিষয় যাকে দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে পার্টি বিবেচনা করেছিল, সেক্ষেত্রে যাকে "বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর" শ্রেণীস্বার্থ বলে পার্টি মনে করেছিল তার উর্ধ্বে কোন "পার্টি স্বার্থ"-কে সে রাখেনি। এই ঘটনা গতানুগতিক অভ্যাসবাদের থেকে পার্টি কতখানি মুক্ত সেটাই দেখিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে, আজকের বিশেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার দলীয় কর্মী পার্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার "পাপে" যেভাবে চরম নির্যাতনের মুখোমুখী হচ্ছে সেই ঘটনা পার্টির সজীবতাকে তুলে ধরে। এটা ঘটনা যে এখনও পর্যন্ত গতানুগতিক অভ্যাসবাদের রাস্তায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েও পার্টি নিজের সজীবতাকে পুরোপুরি খুইয়ে বসেনি।

দ্বিতীয়, সেদিক থেকে দেখতে গেলে, গতানুগতিক অভ্যাসবাদের এই প্রক্রিয়া বামেদের মধ্যকার অন্যান্য সেইসব অংশের ভিতরই আরও বেশী প্রকট, বিশেষত যারা নিজেদের সি পি আই (এম)-এর থেকে বেশী বাম বলে নিজেদের দাবি করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তো আবার এমনকি আন্না হাজারের "দুর্নীতি বিরোধী" আন্দোলনেও সামিল হয়েছেন—যে আন্দোলন কোন গণরায় না নিয়েই তত্ত্বগতভাবে নিজেকে "জনগণের" বিকল্প হিসেবে গণ্য করছে (তার বিবেচনায় যা জনস্বার্থ তার জন্য নিছক কেবল তাত্ত্বিক যুক্তিই সে খাড়া করছে না)। সংবিধান অনুযায়ী জনগণের সত্যিকারের রায় ভোগ করে যে সংস্থা সেই সংসদের থেকেও যে (আন্দোলন) নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সে দাবি করছে এবং এইভাবে "বাছাই করা কয়েকজনকে" সামনে আনতে গিয়ে সে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে খাটো করে দেখার (মাওবাদীরা নিঃসন্দেহে এক ভিন্ন বর্গের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আপাত বিরোধিতার শিকার হয়ে মধ্য ভারতের জঙ্গল অঞ্চলে আলেয়ার পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে তাঁরা, সমস্ত ধরনের প্রধান ধারার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী প্রকল্প থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছেন)।

স্বভাবতই যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল ঃ কেন এ ধরনের গতানুগতিক অভ্যাসবাদ বাম কর্মীবাহিনীর মধ্যে—বিশেষত সি পি আই (এম)-এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে? কারো কারো যুক্তিতে এটা হল সংসদীয় রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি যদিও এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লেনিন সর্বদাই জোর দিয়ে বলেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি তখনই পরিপুষ্ট হয় যখন তা বিপ্লবী শক্তিগুলোকে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। এই কারণেই যে সব রাজনৈতিক সংগঠন "বুনিয়াদী শ্রেণীগুলো"-র কথা বলে বুর্জোয়া সংগঠনগুলো তাদের কাজকর্মের স্বাধীনতার লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা চালায়, যে স্বাধীনতা সংসদীয় গণতন্ত্রের হাত ধরে আসে। এই কারণে বামেদের ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রকে পরিত্যাগ করা তো নয়ই—বরং তার কাজ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সাথে সাথে এগুলোর গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুকে আরও গভীরতর করার জন্য সংগ্রাম চালানো। এটি মার্কসীয় ধ্যানধারণার এতটাই অংশ হয়ে ওঠে যে স্বয়ং রোজা লুক্সেমবার্গের মত বিপ্লবীও বাস্তবিকই চেয়েছিলেন যে জার্মানির সংসদীয় নির্বাচনে তাঁর পার্টি

অংশগ্রহণ করুক এবং তিনি স্পার্টাসিস্টদের অভ্যুত্থানের সপক্ষে ছিলেন না (যদিও কার্ল লিবনেখ্ট তার পক্ষে ছিলেন)। কিন্তু তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং সে জন্য তিনিও লিবনেখ্টের সঙ্গে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। অভ্যুত্থানের মাঝে তাঁদের দুজনকেই হত্যা করা হয়।

গতানুগতিক অভ্যাসবাদকে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখাটা যে কেবলমাত্র তত্ত্বগতভাবে অচল তাই নয়, এটা এক ধরনের অন্ধবিশ্বাসকেও তুলে ধরে। কার্ল মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে "পণ্য সর্বস্বতার" কথা বলেছেন, যেখানে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে কতকগুলো বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক বলে মনে করা হত এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎসকে খোঁজা হত উৎপাদনের উপকরণগুলোতে নিহিত কয়েকটি রহস্যময় গুণের মধ্যে। এখানে আমরা এমন এক অবস্থানকে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আপনা আপনিই কতকগুলো রহস্যময় শক্তিকে আরোপিত করা হচ্ছে।

সংশোধনবাদী তাত্ত্বিক উপলব্ধি

গতানুগতিক অভ্যাসবাদের একটা স্বাভাবিক কারণ হল তত্ত্ব সম্পর্কে সংশোধনবাদী ধারণা বৃদ্ধি পাওয়া—মার্কসীয় তত্ত্বে এ কথা সর্বদাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এটা বেড়ে ওঠার বস্তুগত ভিত্তি সম্পর্কে মার্কসীয় রচনাগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একাংশ যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের থেকে সুবিধা ভোগ করে সেই তথ্যের মধ্যেই এর মূলকে সনাক্ত করা হয়েছে।

১৯৮৬-তে মার্গারেট ভন ট্রটার রোজা লুক্সেমবার্গ নামক ছায়াছবিতে একটা গোটা দৃশ্যজুড়ে কীভাবে গতানুগতিক অভ্যাসবাদী প্রবণতা বেড়ে ওঠে তা দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সমাজগণতন্ত্রী সমগ্র নেতৃবৃন্দ খাবার টেবিল ঘিরে বসে রয়েছেন এবং কার্ল কাউটস্কি রোজা লুক্সেমবার্গকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। সেই সময় লুক্সেমবার্গ ক্লারা জেটকিন ও ফ্রানজ মেরিং-এর সঙ্গে পার্টির বিপ্লবী ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কাউটস্কির প্রশ্ন ছিল ঃ রোজা, তুমি কেন মহিলাদের বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী হও না? কাউটস্কির প্রশ্নের অব্যক্ত অংশটি ছিল এইরকম ঃ তুমি কেন সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লব—এইসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাও? এখানে আমরা একসাথে একজোড়া গতানুগতিক অভ্যাসবাদকে দেখতে পাই ঃ "মহিলা প্রশ্ন"কে সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার গতানুগতিক অভ্যাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। সাথে সাথে দেখি, এক বিশিষ্ট বিপ্লবীকে বলা হচ্ছে, তিনি যেন নিজেকে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে রেখে অন্য কিছুর মধ্যে ডুবে থাকেন।

কিন্তু যখন পার্টির তাত্ত্বিক উপলব্ধির মধ্যে স্পষ্টত কোন পরিবর্তন ঘটে না এবং লেনিন ও অন্যান্যদের দ্বারা জোর দিয়ে তুলে ধরা কোন স্বাভাবিক বস্তুগত বুনিয়াদও গড়ে ওঠে না (যথা, উন্নত বস্তুগত অবস্থা—যা থেকে "বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর" একাংশের পক্ষে অন্যদের "চরম শোষণ" থেকে ফায়দা তোলা সম্ভবপর হয়)—যার দ্বারা তাত্ত্বিক উপলব্ধির এই জাতীয় বদলে যাওয়ার কারণ নিরূপণ করা যায়, তখন গতানুগতিক অভ্যাসবাদের বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অনেক কিছু বাকী থেকে যায়। যে পরিস্থিতি এই জাতীয় গতানুগতিক অভ্যাসবাদকে চাগিয়ে তোলে তা হল গণআন্দোলন একটা উচ্চতায় পৌঁছে স্থিতাবস্থার মধ্যে আটকে যাওয়া।

ঐ স্থিতাবস্থা একটা ভীতির জন্ম দেয়—যা থেকে মনে হয় পিছন দিকে আবার পিছলে যাব না তো! এই পিছলে যাওয়াকে ঠেকাতে নানা অস্থায়ী সব পদক্ষেপের আশ্রয় নেওয়া হতে থাকে—যা থেকেই গতানুগতিক অভ্যাসবাদের সূচনা। কিন্তু এই গতানুগতিক অভ্যাসবাদই উল্টে আবার আন্দোলনের মধ্যকার স্থিতাবস্থাকে বাড়িয়ে তোলে—যা পুনরায় আরো গতানুগতিক অভ্যাসবাদকে জোরদার করে তোলে। আর এভাবেই, আগেই যার উল্লেখ করা হয়েছে, গতানুগতিক অভ্যাসবাদের দ্বান্দ্বিক রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৬৮-র চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কিত এক কাহিনীতে এ ধরনের দ্বান্দ্বিকতার বিষয়ে বিশদে বলা হয়েছে। "প্রাগ বসন্তের" সময় আলেকজাণ্ডার ডুবচেক-এর গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে (সোভিয়েত কর্তৃক ডুবচেকের অপসারণের আগে) আলোচনা চলাকালীন জানায় যে "প্রাগ বসন্তের" যেন কোনরকম ক্ষতিসাধন না করা হয়, কেননা পশ্চিম ইউরোপের বাম আন্দোলনের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। এ প্রশ্নে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের উত্তর ছিল, "বাজে কথা বলবেন না। পশ্চিম ইউরোপে বামদের বিস্তার ঘটানোর কোন সম্ভাবনা নেই!"[১] ডুবচেকের অপসারণ নিশ্চিতভাবেই পশ্চিম ইউরোপে বামেদের কোন ধরনের বিস্তার ঘটানোর সামান্যতম সম্ভাবনাকেও শেষ করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে গতানুগতিক অভ্যাসবাদের প্রক্রিয়ার জন্ম পশ্চিম ইউরোপে বাম আন্দোলনের স্থিতাবস্থার জন্যই হয়েছে। "প্রাগ বসন্তে"-র কোন "ঝুঁকি" না নিয়ে পূর্ব ইউরোপে নিজের যে নিয়ন্ত্রণকে মজবুত করার ভাবনার মধ্যেই সোভিয়েত নেতৃত্বের গতানুগতিক অভ্যাসবাদ অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তা বামদের পশ্চিম ইউরোপে যে গতিরুদ্ধ তা তাকেই আরও জোরদার করেছে।

সি পি আই (এম)-এর অবস্থা

সি পি আই (এম) অনেকটা একইরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। কেবলমাত্র দেশের কয়েকটি অঞ্চলেই পার্টির শক্তি সীমাবদ্ধ। এইসব অঞ্চলেও পার্টির যে ভিত্তি আছে তাও ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে গড়ে তোলা সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। যদিও এর পরবর্তীকালেও পার্টির এই ভিত্তির বিস্তার ঘটেছে (তা না হলে পার্টি যে তিনটি রাজ্যে শাসন পরিচালনা করেছে সেসব স্থানে সে এত ব্যাপক নির্বাচনী সমর্থন ভোগ করত না) কিন্তু সেই বিস্তৃতিও একটা স্থিতাবস্থায় এসে ঠেকেছে। প্রাথমিকভাবে এই গতিরুদ্ধতার প্রতিকার হিসেবে যে জায়গায় পার্টি আগে থেকেই আছে সেই জায়গাটাকেই, পার্টি নিজের ভাবনা অনুযায়ী যতখানি ভালভাবে সম্ভব শক্তপোক্ত করার উদ্যোগ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, নিজেকে সংহত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে "শিল্পায়ন" ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়, যাতে করে মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতাকে রোধ করা যায়। অন্যত্র পার্টি বাড়ছে না এই বিবেচনায় এই কাজটিকেই আবশ্যিক ভাবা হয়। কিন্তু এটাই বাস্তবে অন্য জায়গায় পার্টির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সারা দেশে বর্তমানে সংগ্রামের যা প্রধান বিষয় সেই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পার্টির সামর্থ্যে টান ধরে কেন না সিঙ্গুরের মত ঘটনার ফলে পার্টি তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

স্থিতাবস্থা থেকে গতানুগতিক অভ্যাসবাদের ঝোঁক দেখা দিতে পারে, কিন্তু স্থিতাবস্থা ও

গতানুগতিক অভ্যাসবাদের কোনটিকেই যে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের মধ্যে সি পি আই (এম)-কে কাজ চালাতে হয় তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের ওপর বিরাট আঘাত হেনেছে। যদিও সি পি আই (এম) একটি সুশৃঙ্খল দল হওয়ার ফলে এ থেকে তার কর্মীবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ আত্মবিশ্বাস যে ধাক্কা খেয়েছে তা অনস্বীকার্য। স্বাভাবিকভাবেই, চীন যে পথ অনুসরণ করছে সেটা আশঙ্কাজনক জেনেও চীনের প্রতি আস্থা স্থাপনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। চীনের অসাধারণ আর্থিক "সাফল্য" এই বিশ্বাসকে জোরদার করেছে। যে পার্টি একদিন মতাদর্শের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উভয়েরই—একটির দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জন্য ও অপরটির বামপন্থী বিচ্যুতির জন্য—সমালোচনা করার সাহস রাখত, এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করার ফলে সে এখন এক সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে চীনের উন্নয়নকে ঘিরে প্রকাশ্যে (নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় অহরহ আপত্তি জানালেও) কোন ভিন্নমত রাখার লক্ষ্যণীয় বাকসংযম দেখিয়ে চলেছে। অধিকন্তু, চীনের আপাত "সাফল্য" পার্টির মধ্যে (চীনের মত) যে সব রাজ্যের পার্টি ক্ষমতায় আছে সেখানে কর্পোরেট পুঁজিকে আর্থিক উৎসাহ দেওয়ার মত আর্থিক নীতি মেনে নেওয়ার প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। অথচ এই কাজকে কয়েক বছর আগেও বর্জনীয় পাপ হিসেবে দেখা হত। বস্তুতপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পার্টির গতানুগতিক অভ্যাসবাদের মস্ত কারণ হল চীনা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

অন্য আর একটি অতিরিক্ত বিষয়ও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। এটি যে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত তা হল, কমিউনিস্ট লেখা-পত্রে "ভূমি সংস্কারের পরে কী?" —এই প্রশ্নের যথাযথ সন্তোষজনক উত্তর মেলে না। সমাজগণতন্ত্রের দুই কৌশল—লেনিনের এই ধ্রুপদী রচনা লেখা হয়েছিল রাশিয়ার পটভূমিতে—বিংশ শতাব্দীতে। যে সমস্ত দেশে বুর্জোয়ারা রঙ্গমঞ্চে এসেছে অনেক দেরীতে সেই সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট অনুশীলনের জন্য এই লেখা তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছে। লেনিনের সূত্রায়ন হল—

স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্বলস্থিতিকে পঙ্গু করার জন্য কৃষক জনগণের সাথে মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ হওয়া অবধি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সর্বহারা শ্রেণী অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করবে, নিজেকে জনগণের মধ্যকার আধা-সর্বহারা উপাদানগুলোর সঙ্গে যুক্ত করবে—যাতে করে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধকে সবলে চূর্ণ করা এবং কৃষক ও পাতি বুর্জোয়াদের দুর্বলস্থিতিকে পঙ্গু করে দেওয়া যায় (১৯৭৭, ৪৯৪)।

তৃতীয় বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনসমূহ বক্তব্যটির প্রথম অংশ স্পষ্ট অনুধাবন করে এবং প্রয়োগে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রথম থেকে দ্বিতীয় ধাপে উত্তরণের সময় যখন এটি ঘটবেই, তখন যাদের লক্ষ্য করে এটি চালিত হবে সেই শ্রেণী শক্তিগুলোর সঙ্গে আন্তসম্পর্ক কেমন হবে, বিশেষত কৃষকদের প্রতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কী দৃষ্টিভঙ্গী হবে, সেগুলো বিব্রতকর প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথ উদ্যোগের উপাখ্যান থেকে (সে সময় কুলাকদের প্রতিরোধের মুখে এ ছাড়া বিকল্প ছিল না ধরে নিয়েও) চীনের সামনের দিকে বিশাল উল্লম্ফন

(যদি কেউ বিশ্বাসও করে, বিশাল উল্লম্ফনের সমস্যাটা ছিল, চিন্তার দিক থেকে এটা ভুল না হলেও যে সময়ে এটির ডাক দেওয়া হয় তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সঠিক ছিল না) পর্যন্ত, দ্বিতীয় স্তরের এই উত্তরণ পর্বে যে সমস্ত সমস্যা উঠে এসেছে প্রতি ক্ষেত্রেই তা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পকেই লাইনচ্যুত করে দিয়েছে।

কৃষি সংস্কারের পর কী?

কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হওয়ার পর কী করা হবে এই সমস্যা কমিউনিস্ট বিপ্লবী প্রকল্পকে যদি অস্বস্তির মুখে ফেলে দেয় তাহলে ভারতের মতো দেশে একটি সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া কাঠামোর অধীন বামেদের দ্বারা চালিত কয়েকটি রাজ্য সরকারের সামনেও প্রশ্নগুলো হাজির না হয়ে পারে না। এইসব রাজ্যে অর্থনীতির আধুনিক ক্ষেত্রগুলোতে কর্মরত উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক হিসেবে খাঁটি সর্বহারার সংখ্যা বেশ কম—অথচ সেখানে শিল্পায়নের শ্লোগান—তাও বা আবার বৃহৎ বেসরকারি ব্যক্তি পুঁজির ওপর নির্ভর করে—শিল্পায়ন গতি পেতে শুরু করেছে। এটা আবার, ভাবনার জগতে "স্টেজ থিওরির" জন্ম দিয়েছে যার প্রকাশ ঃ ভূমি সংস্কারের পর প্রথমে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানো যাক আর তারপর পরবর্তী স্তর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভাবা যাবে।

কিন্তু এই স্টেজ থিওরি (ধাপে ধাপে এগোবার তত্ত্ব—অনুঃ) গতানুগতিক অভ্যাসবাদের এক প্রত্যক্ষ তাত্ত্বিক প্রকাশ। প্রথম দর্শনে এটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। অনেকে এমনকি মার্কসীয় তত্ত্বের ইতিহাসটাকেই "স্টেজ থিওরির" উদাহরণ হিসেবে ভাবতে পারেন। কিন্তু এটি ভুল ভাবনা। কারণ মার্কসবাদ ইতিহাসকে উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখে চলা নিছক "স্টেজ" (ধাপ) হিসেবে বর্ণনা করে না বা বিভক্ত করে না। বরং সে ইতিহাসের গতিসূত্রকে একধাপ থেকে অপর ধাপে উত্তরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়।[২]

আরও প্রাসঙ্গিকভাবে এটাও মনে করা যেতে পারে যে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার প্রকল্পটি তো আদতে "এখানে এবং এখনই"-কে বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত করে, কারণ তা বিপ্লব সম্পর্কে ধারণারই অন্তর্গত। কিন্তু এটা সঠিক নয়। পুঁজিবাদ গঠনের জন্য বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোকে দমনের দরকার হয়, আর পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার জন্য বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোকে আরো সক্রিয় করে তোলার প্রয়োজন হয়। যে অনুমানের ভিত্তিতে এই স্টেজ থিওরি তা কমিউনিস্টরা মেনে নিলে বলতে হবে—

একটা সময় যে পার্টি বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোকে দমনে নেতৃত্ব দিয়েছে সেই পার্টি হঠাৎ ও রহস্যময়ভাবে ঠিক বিপরীত আচরণ শুরু করবে আর বুনিয়াদী শ্রেণীগুলো তাকে উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণ করবে—যা নিতান্তই আজগুবি। যে পার্টি পুঁজিবাদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় তাকে অন্যান্য সাধারণ বুর্জোয়া দলগুলোর থেকে অবশেষে কোনভাবেই আলাদা করা যাবে না। বিপ্লবের কথা মুখে যতই বলা হোক না কেন, অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলোর মত একইভাবে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গতানুগতিক অভ্যাসবাদেরই নিদর্শন।

গতানুগতিক অভ্যাসবাদের দিকে ঠেলছে যে সব শক্তিগুলো

এটা অজানা নয় যে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রবলতর শক্তিসমূহ বামেদের গতানুগতিক অভ্যাসবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। এইসব ধাক্কাগুলোকে বামদের প্রতিহত করতে

হবে। যদি সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে গতানুগতিক অভ্যাসবাদকে কাটিয়ে তুলতেই হবে। সম্ভাব্য প্রতিটি স্থানে আজকের দিনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে নিয়ে বামদের সংগ্রাম চালাতেই হবে। এইসব সংগ্রাম বাম শাসিত রাজ্য সরকারগুলোকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে বা বিপন্ন করতে পারে, সেই যুক্তিতে ঐসব সরকারগুলোকে রক্ষা করার গতানুগতিক অভ্যাসবাদ নির্দেশিত কৌশলকে উপেক্ষা করেই তা করতে হবে। শুধু এটা করলেই হবে না, বরং এই সরকারগুলো পরিচালনার সাথে সাথে বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থার উন্নতি সাধনে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে পার্টিকে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এর কোন কিছুই সহজ নয়, কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা বামেদের করতেই হবে। কেরলের এল ডি এফ-এর অভিজ্ঞতা থেকে যা আমি বুঝেছি তার ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস, সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বামেদের পক্ষে তার সমাধান সম্ভব।

নানা মহল থেকে বামেদের প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্নরা তাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটানোর জন্য আরও বেশী করে গতানুগতিক অভ্যাসবাদী হওয়ার যেসব পরামর্শ দিচ্ছেন সেগুলোতে বামেদের অবশ্যই কর্ণপাত করা চলবে না। বিশেষ দু-ধরনের পরামর্শ হাজির করা হচ্ছে। প্রথমটিতে বলা হচ্ছে, বামেদের "সমাজগণতন্ত্রী" হওয়া উচিত। এটার দ্বারা মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদের ধারণাকেই ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। এর অর্থ হল, মানবিক মনোভাবাপন্ন এক সমাজ যা অন্য দেশ ও জনগণের ওপর নিপীড়ন চালায় না। পুঁজিবাদের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ—এই ধরনের স্বীকার করে নেওয়া। সংক্ষেপে এই পরামর্শের অর্থ ঃ বামেদের উত্তরণশীলতার গোটা প্রকল্পটিকেই পরিত্যাগ করতে বলা।

বুনিয়াদী জনগণকেই পরিত্যাগ করা?

এখন, সাম্রাজ্যবাদের যদি সত্যিকার অস্তিত্বই না থাকে, যদি তা বামেদের কল্পনার মায়াবিভ্রম হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হয়, এই তত্ত্বকে অনুসরণ করার জন্যই বামেরা বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর স্বার্থে সংগ্রামে চালাতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন। সেক্ষেত্রে এই পরামর্শের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কোন অস্তিত্ব নেই—এমন যুক্তির ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না। দেওয়া হচ্ছে এই যুক্তিতে যে, বামেরা যদি এইসব বাজে ধারণা ত্যাগ করে তাহলে তাদের "বিকাশ" ঘটতে পারে। এটা গতানুগতিক অভ্যাসবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ এটাই বলা, বামেরা যে বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী, যে শ্রেণীগুলো সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের মূল উপাদান আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির চাপিয়ে দেওয়া নীতিগুলোর ফলে সর্বত্র অবদমিত হচ্ছে, সেই শ্রেণীগুলোর স্বার্থকে দূরে সরিয়ে রেখে বামেদের উচিত নিজেদের "পার্টি স্বার্থে" কাজ করা। সংক্ষেপে এর মানে দাঁড়ায়, বামেদের পক্ষে বাম হিসেবে নিজেদের আত্মবিলোপ ঘটানো, তার ফলে তাদের যতই নির্বাচনী সাফল্য জুটুক না কেন।

দ্বিতীয় পরামর্শটি হল, বড় বড় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে বাইরে রেখে এক ভারতীয় বাম-এর কথা বলা, যেখানে জনপ্রিয় আন্দোলনগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য "ভারতীয় নয়া বাম" গঠন করা দরকার, যার মধ্যে দেশের নানা অংশে বিশেষ বিশেষ স্থানীয় সমস্যাকে

নিয়ে আন্দোলনরত প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। এই ভাবনার কোন কোন প্রবক্তা সি পি আই (এম)-কে বাদ দিয়ে অন্যান্য কমিউনিস্টদের এই জাতীয় মোর্চায় সামিল হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পান। অনেকে আবার এমন কি সি পি আই (এম)-কেও এই মোর্চার অন্তর্ভুক্ত করার "ঔদার্য" দেখিয়েছেন, যদি অবশ্য সি পি আই (এম) তার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করে তাহলেই। এই সমস্ত গ্রুপগুলো যাদের নিয়ে তথাকথিত "ভারতীয় নয়া বাম"-দের মূল কেন্দ্র গঠনের জল্পনাকল্পনা হচ্ছে তাদের সবার মধ্যে একটি সাধারণ চরিত্র লক্ষিত হয়। সেটি হল তারা কেউই সাম্রাজ্যবাদকে একটি বর্গ বলে বিবেচনা করে না। তারা হয়ত ইরাক বা আফগানিস্তান আক্রমণ বা লিবিয়ায় বোমা বর্ষণের মত "সাম্রাজ্যবাদী" কার্যকলাপকে স্বীকার করে বা বিরোধিতাও করে, কিন্তু তারা সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদেরই এক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখে না।

পুঁজিবাদের এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই বিগত ১০০ বছর ধরে পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার বাস্তব প্রয়োজনকে ঘিরে বিতর্ক চলছে। তত্ত্বগতভাবে এই ধারণাটিকে বর্জন করাটা, পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পটিকে পরিত্যাগ করারই সমতুল, যদিও আমি পুনরায় বলব, এই বর্জনের পিছনে কোন যুক্তিই হাজির করা হয়নি। এর দ্বারা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হওয়াটাই ঘটে যায়, জনগণের পক্ষ নিয়ে কিছু কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নে লড়াই চালালেও সামগ্রিক কাঠামোটাকে অক্ষতই রেখে দেওয়া হয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এর অর্থ দাঁড়ায়—পুঁজিবাদের মধ্য থেকেই নিতান্ত কিছু সংস্কারের জন্য সংগ্রাম চালানো, সমাজতন্ত্রের জন্য নয়।

পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন

এটা অবশ্য ভাবাই যেতে পারে যে সমাজতন্ত্র হল এক অলীক কল্পনা, আর সে জায়গায় সংস্কারের জন্য লড়াইটা জনগণের অবস্থার উন্নতি বিধানের এক নির্দিষ্ট উপায়। উদাহরণস্বরূপ, দলিতদের অগ্রগতির জন্য কিংবা মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কোন আন্দোলন, পুঁজিবাদ না সমাজবাদ—এই বিতর্কে না গিয়েও কিছু আদায় করতে সক্ষম। কিন্তু এ এক ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত। গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার কোন উন্নতি অথবা জাত-পাত প্রথার ওপর নির্ধারক কোন আঘাত হানার জন্য প্রয়োজন পুরনো প্রাক পুঁজিবাদী "গোষ্ঠী"র বিভাজন। পুঁজিবাদ বড় বড় শহরগুলোতে তার ঘাঁটিতে ঐতিহাসিকভাবে ঠিক এই কাজটাই করেছে। আর সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রয়োজন এক নতুন "সম্প্রদায়ের" উদ্ভব—যেখানে আদি জন্মভূমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষেরা নিজেদের ব্যক্তি অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছায় তার সাথে যুক্ত হয়, আবদ্ধ হয় নতুন উঠে আসা এক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে। কিন্তু আমাদের দেশে পুঁজিবাদ—তার আপাত প্রাণবন্ত বিকাশ সত্ত্বেও চিরাচরিত বাসভূমি থেকে উৎখাত হওয়া ব্যক্তিদের নতুন এক সর্বহারাশ্রেণী হিসেবে সম্পৃক্ত করতে না পারার অক্ষমতার কারণে পুরনো "গোষ্ঠী" থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ব্যর্থ হয়েছে, এই ব্যর্থতার নেপথ্যে রয়েছে "কর্মসংস্থানহীন বিকাশের" বাস্তবতা। বিকাশের উচ্চহারের পাশাপাশি খাপ পঞ্চায়েতের সহাবস্থানের এটাই কারণ। আর যত দিন খাপ পঞ্চায়েতের মত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থেকে যাবে ততদিন দলিত অথবা মহিলাদের অগ্রগতির পথে বাধার শিকলগুলি চেপে ধরতে থাকবে।

এই কারণেই আগের যে কোন সময়ের মত পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদের প্রশ্নটি আজও সমাজ গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে।[৩]

প্রত্যেকেরই অবশ্য নিজের পছন্দমত রাজনৈতিক তত্ত্ব বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। কেউ পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পকে বাদ দিয়ে সংস্কারপন্থীদের বেছে নিতেই পারেন। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী তা ভ্রান্ত কাঠামো বলেই গণ্য হবে—এজন্য নয় যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকাঙ্খাটা ইচ্ছানিরপেক্ষ। কারণটা হল সংস্কারের জন্য যত লড়াই-ই চালানো হোক না কেন সে সবের দ্বারা পুঁজিবাদকে মানবিক দরদপূর্ণ সমাজে পরিণত করা সম্ভব হবে না। এই প্রস্তাবনার অসারতা আমার মনে হয় আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এমন একটি সময়ে যখন বহুসংখ্যক মানুষ সাম্রাজ্যবাদের ধারণাকে পরিত্যাগ করেছে, যখন লগ্নিপুঁজির "টাকা খাওয়া ভাড়াটিয়া" থেকে শুরু করে অনেক পশ্চিমী মার্কসবাদী, চীনের "সরকারি" মুখপাত্রেরা, এমনকি ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, বিকাশের তথাকথিত উচ্চহার দেখে চমকিত যদিও তা দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই কেবল পুষ্টিবৃদ্ধি হয়েছে, তখন একমাত্র সি পি আই (এম)-ই এই ধারণার প্রতি দৃঢ় আস্থা বজায় রেখেছে এবং লেনিন ও অন্যান্যদের বুদ্ধিদীপ্তিতে নির্মিত এক স্তর অন্য স্তরে অতিক্রমণ ঘটানোর সমগ্র প্রকল্পটিকে অনুসরণ করে চলেছে। যতদিন এই ধারণা ও প্রকল্প অকাট্য হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সি পি আই (এম)-এর প্রাসঙ্গিকতা অক্ষত থেকে যাবে। যদি কোনভাবে পার্টিতে চলতে থাকা গতানুগতিক অভ্যাসবাদের প্রক্রিয়াকে পার্টি রোধ করতে না পারে এবং বুর্জোয়া তত্ত্বের আধিপত্যকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে তাহলে আজকের সি পি আই (এম) যে তাত্ত্বিক অবস্থানে আস্থাশীল অনুরূপ অবস্থানে বিশ্বাসী অপর কোন কমিউনিস্ট সংগঠন এগিয়ে এসে তার স্থান গ্রহণ করবে। কিন্তু সংস্কারপন্থী শক্তিসমূহের কোন মোর্চা—তা সে যতই কেতাদুরস্ত ও নিষ্ঠাবান হোক না কেন, বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর স্বার্থের রক্ষক হিসেবে কমিউনিস্টদের জায়গা নিজেকে দিয়ে সম্ভবত প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের সাথে সাধারণ ইস্যুগুলোতে একযোগে কাজ করাতে অবশ্য বাধা থাকতে পারে না।

সূত্র ঃ

১। ব্রিটেনের কেম্ব্রিজে ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে টনি গ্রুপের (যারা বাম ফ্যাকল্টি সদস্য) সাথে ডুবচেকের টীমের মিটিংয়ে এক নির্বাসিত সদস্য এ কথা বলেছিলেন, মিটিংয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম।

২। মার্কসীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে স্টেজ থিওরির ওপর বিতর্কমূলক আলোচনা জানতে ব্যারান ও হব্‌সওয়মের লেখা বই 'দি স্টেজেস অফ ইকনমিক গ্রোথ"-এর ডব্লিউ ডব্লিউ রস্‌টো কৃত পুস্তক-সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

৩। এই যুক্তির ওপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য পটনায়েক (২০১১) দ্রষ্টব্য।

(ই পি ডব্লিউ, ১৬ জুলাই ২০১১ সংখ্যা থেকে)

বামেদের পড়ন্ত দশা

একটি সমালোচনামূলক ভাষ্য

হীরেন গোহাইঁ

বড় প্রত্যাশা নিয়ে প্রভাত পটনায়েকের সুচিন্তিত নিবন্ধ 'বামেদের পড়ন্ত দশা' পাঠ করার পর আমি কিন্তু বেশ নিরাশই হলাম (১৬ জুলাই ২০১১)। বামেদের মধ্যে বেড়ে চলা কয়েকটি দিক যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে পরিপক্ক হয়ে ওঠে সেগুলোর উদ্বেগজনক তাৎপর্যকে হয় নিবন্ধটিতে উপেক্ষা করা হয়েছে নতুবা সেগুলোকে হালকা করে দেখা হয়েছে। তাঁর যুক্তিসমূহের কেবলমাত্র একটি অংশের প্রতি, যা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণও বটে, আমার মন্তব্যকে আমি সীমাবদ্ধ রাখব এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাধারার বিকাশের কথা উল্লেখ করব।

গতানুগতিক অভ্যাসবাদ

কথার মারপ্যাঁচ যতই থাকুক না কেন, 'গতানুগতিক অভ্যাসবাদ' শব্দনিবন্ধটির মধ্যে নিহিত বিপজ্জনক প্রবণতাটিকে যে কেউ সনাক্ত করতে পারেন। এর দ্বারা আমলাতান্ত্রিকতা ও মাতববরির ঝোঁক, পরিস্থিতিকে বিপ্লবী অনুশীলনের মাধ্যমে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা—যা থেকে "পার্টি স্বার্থের" সাথে বুনিয়াদী জনগণের স্বার্থের বিচ্ছেদ ঘটে যেতে থাকে, চরিত্রের দিক থেকে বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে ক্রমশই পার্টির একাকার হয়ে ওঠা এবং বিশ্ব ইতিহাসের এমন এক সময় কার্যত সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটিকেই নাকচ করে দেওয়া যখন সাম্রাজ্যবাদ বিপজ্জনকভাবে সবকিছুকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত— এ সমস্ত কিছুই বোঝানো যেতে পারে। ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে আংশিক রূপায়ণের পর বাম দলগুলো যখন একটা চরায় এসে আটকে গেছে তখন তার বিপ্লবী পথ থেকে সরে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চীনা দৃষ্টান্তের প্রভাবকে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই যদি সামগ্রিক ছবি হয়ে থাকে তাহলে পরিচিত ও সোজাসাপটা 'সংশোধনবাদ' শব্দটি ব্যবহার করতে অসুবিধা কোথায় তা বোধগম্য হচ্ছে না। আর একবার যদি এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ভুল শুধরে সঠিক পথ অন্বেষণের জন্য নিরন্তর গভীর প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়বে।

আসলে চারটি প্রবণতাই নিবিড়ভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং বিপ্লবী দায়িত্বকে বিসর্জন দেওয়ার একই উৎস থেকে তাদের যাত্রা শুরু। এর দ্বারা কেবল যে শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে পার্টির অভিজ্ঞতার সাথে তাত্ত্বিক সমন্বয়ের অভাব বা ঘাটতিরই ব্যাখ্যা মেলে তাই নয় (রাজ্য স্তরে বামফ্রন্টের ক্ষমতা ধরে রাখার অভিজ্ঞতাকে কখনোই তীক্ষ্ণ ও আলোকিত করতে পারার মতন করে সারসংকলন করা হয়নি, যা হয়েছে তা কেবল ক্লান্তিকর একঘেয়ে কথার চর্বিতচর্বণ), পরন্তু এ থেকে বুর্জোয়া রাজনীতির বাধ্যবাধকতাজনিত ব্যবহারিক

আপসরফাগুলোরও, যথা সাম্প্রদায়িক শক্তির কারো কারোর সমর্থন ভিক্ষা করা ও কেন্দ্রে স্বল্পস্থায়ী কোয়ালিশন গড়তে সহায়তা জোগানো ইত্যাদিরও ব্যাখ্যা মেলে। এইসব অনুশীলন তৃণমূল স্তরে সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার জরুরী কাজ থেকে পার্টি বা পার্টিগুলোর মনোযোগকে দূরে সরিয়ে রাখে।

জনগণকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তুলতে সংসদীয় গণতন্ত্রের দেওয়া সুযোগগুলোকে বামেদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে, এই ধারণা সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু নানা ধরনের স্বৈরাচারের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার নামে বামেরা যদি ক্রমাগত সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালিতে ডুবে যেতে থাকে তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কারণ এটা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতে যে সংসদীয় ব্যবস্থা বহাল আছে তার ভিত খুবই অগভীর ও ভঙ্গুর।

সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ

'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' (১ম ভাগ) রচনায় মার্কস উল্লেখ করেছেন," অধিকার কখনও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তার দ্বারা নির্ধারিত সাংস্কৃতিক বিকাশের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।" সমসাময়িক ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন উন্নত পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের অনুরূপ হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শক্তিশালী সামন্ত অবশেষগুলো আমলাতন্ত্র ও সামন্ত মনোভাবাপন্ন পুলিশবাহিনীর সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশের ওপরে আজও আধিপত্য করে চলেছে। জনগণের একটি ছোট অংশই কেবল নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। জনসাধারণের বিশাল অংশকেই সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শ্বাসরোধ করে রাখা হয়েছে যেখানে এইসব অধিকার তাদের কাছে অর্থহীন। ধারাবাহিক নিপীড়নের এই বিপন্ন শিকারদের সাথে নিয়ে এই অধিকারগুলো অর্জনের জন্য বামেদের সংগ্রাম চালাতে কেউই দেখেননি। বরং রকমারি অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো (এন জি ও)—যাদের না আছে কোন ঐক্যবদ্ধ ব্লক না তারা মতাদর্শগতভাবে সমমনোভাবাপন্ন—তাদেরই এই ধরনের সংগ্রামের সামনের সারিতে বলে মনে হয়। প্রকৃত ঘটনা এবং ময়দানের লড়াইয়ের পরিশ্রম থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বামেরা সংসদ কক্ষ ও বিধানসভার মঞ্চ থেকে এইসব অধিকারের জন্য লড়াই চালায়। দেশের নানা অংশে একেবারে নিচুতলায় সমাবেশ গড়ে তোলা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকারগুলোকে শুধু যে পুলিশ এবং ধনী জমিদারদের ভাড়াটে সেনারাই দমন করে তাই নয় পরন্তু চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বারাও সেগুলো অবদমিত হয়।

শাসকশ্রেণীর এই জাতীয় মনোভাবের সাথে বাস্তবত একাকার হয়ে যাওয়াটা নিকৃষ্টভাবে ধরা পড়ে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জনপ্রিয় প্রতিবাদগুলো দমনের সময়। সেক্ষেত্রে "পার্টি স্বার্থ" নিশ্চিতভাবেই বুনিয়াদী শ্রেণীগুলোর স্বার্থকে ছাপিয়ে গেছে। এটাকে কি নিছক "গতানুগতিক অভ্যাসবাদ" আখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যায়?

সংসদেও বামেদের ভূমিকা প্রত্যাশাপূরণ করতে অক্ষম। মাঝে মধ্যে সরকারের

নীতিগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা চালাতে এবং জনবিরোধী নীতি ও আইনের বিরোধিতা করতে তাদের দেখা গেছে বটে, কিন্তু তাতে কাজের কাজ খুব সামান্যই হয়েছে। সরকারের শ্রেণীস্বার্থ থেকে জনগণের যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে সংসদে তাদের ভূমিকা সে সম্পর্কে জনগণকে জাগরিত করতে পারেনি বা সেগুলোর বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধকেও জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এমন কি বহুকষ্টে অর্জিত শ্রমের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার ও ব্যক্তি পুঁজির নয়া উদারবাদী যৌথ হামলার বিরুদ্ধে তারা তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের প্রথাসিদ্ধ যুক্তিও এক্ষেত্রে বেসুরো বেজেছে।

ব্যাধির শিকড় অনেক গভীরে?

এই ব্যর্থতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এ কি কেবলই কৌশলগত ত্রুটি না কি অন্য কোন গভীরে নিহিত ব্যাধি? এমনকি আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তির প্রশংসনীয় অনমনীয় বিরোধিতাও মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নেও সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামের সাথে সংসদীয় সংগ্রামকে সমন্বিত করার মাধ্যমে বামেরা তার তাৎপর্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোই অধিকতর ফায়দা উঠিয়েছে। তাই যে উপসংহারে পৌঁছতে হয় তা হল, তাদের জোড়াতালি লাগানো সংসদীয় ভূমিকা বুর্জোয়া শক্তিগুলোকেই কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে। এটাকে কি গতানুগতিক অভ্যাসবাদের ফল বলা চলে? নাকি এটা তার থেকেও বেশী কিছু?

সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ বলতে রাজ্যগুলোতে ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতায় টিকে থাকাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। এর অর্থ হল, কেন্দ্রীয় নীতিসমূহকে কিছু পরিমাণে মেনে নেওয়া, পুলিশের জনবিরোধী ভূমিকায় মৌন সম্মতি প্রদান এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আপস করে চলা। এটা সত্যি, নিচুতলায় কিছু পরিমাণে ক্ষমতা-বণ্টনের কাজ হয়েছে এবং পঞ্চায়েতগুলোর ভালই গণচরিত্র থেকেছে। সেখানেও কিন্তু পার্টি জনগণের সেবার হাতিয়ার না হয়ে আধিপত্য বিস্তারের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

সর্বোপরি, ব্যক্তি পুঁজিনির্ভর ও রপ্তানিমুখী এবং মূলত কর্মসংস্থানবিহীন বৃদ্ধির জয়গান গেয়ে চলা বর্তমান যে পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রতিকল্পটি রয়েছে বামেরা তার বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং জল, জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর থেকে জনগণের অধিকারকে কেড়ে নিয়ে জনবিরোধী নীতিগুলোকে গ্রহণ করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

নির্বাচনী উন্মত্ততা—যা প্রায়শ গণতান্ত্রিক ঐক্যকে বিনষ্ট করে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাধায় এবং ক্ষমতার মোহ বামেদের সংসদ বহির্ভূত উদ্যোগ ও কর্মসূচীগুলোকে ভীষণভাবে দুর্বল করেছে এবং সেগুলোকে প্রাণহীন অনুষ্ঠান সর্বস্ব করে তুলেছে। এইসব কাজে দক্ষিণপন্থীরা অধিকতর কল্পনাশক্তি (প্রতিক্রিয়াশীল ধাঁচের) ও সজীবতা দেখাতে পেরেছে। (বুর্জোয়া) রাষ্ট্রকে জনগণের মঙ্গলের জন্য ইতিবাচক ক্ষমতার উৎস হিসেবে

গণ্য করে তার ওপর নির্ভর করার অসচেতন প্রবণতা বামেদের তৃণমূলস্তরে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রাণশক্তিকে অনেকটাই শুষে নিয়েছে। এই মুহূর্তে অবাধ নয়া উদারনৈতিক নীতিসমূহ শ্রমিকদের জীবনকে মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সংকট ও বেকারত্বে জেরবার ও বিপন্ন করে তুলছে। জনগণের বিশাল সংখ্যক অংশ সর্বহারা হতে চলেছেন এবং ঠিকা প্রথায় নিয়োগের মাধ্যমে তাদের ওপর পাশবিক শোষণ চালানো হচ্ছে। অথচ তাদের জঙ্গী এক শক্তি হিসেবে সংগঠিত করা হচ্ছে না। বরং দুর্দশার সমুদ্রের মাঝে দ্বীপসমূহের মত তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা এন জি ও-গুলোর মধ্যে। সহজেই তারা নানা কুসংস্কার, ধর্মীয় পাগলামি ও শয়ে শয়ে গজিয়ে ওঠা গোষ্ঠীর দুর্বুদ্ধির শিকার হয়ে পড়ে।

আমি আশা করি, উপরে বর্ণিত অসম্পূর্ণ বিবরণী থেকে দেখানো গেছে কেমন করে, বর্তমান ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি এক বিশেষ অবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী মতাদর্শকে লঘু ও অনুশীলনকে তেজহীন করে দিয়েছে। এই প্রবণতা প্রহরায় শৈথিল্য আনতে ও পার্টির নিচুতলায় সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত উপাদানগুলোর বড় মাত্রায় অনুপ্রবেশ ঘটাতে উৎসাহ জুগিয়েছে। গতানুগতিক অভ্যাস সর্বস্বতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পট্টনায়েক এটা বিশ্বাস করেন না যে পার্টির শ্রেণী চরিত্রেই বদল ঘটে গেছে। কিন্তু "বুনিয়াদী শ্রেণীগুলো থেকে বিচ্ছিন্নতার" অন্য আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

(ই পি ডব্লিউ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১)

এক বাম পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে

।। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।।

এ বছরের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও বামফ্রন্ট যেভাবে ধাক্কা খেয়েছে, তাতে ভারতে বাম আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যাপক জল্পনাকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। সম্পূর্ণ পূর্বানুমান অনুযায়ীই, প্রভাবশালী "মূলধারার সংবাদমাধ্যমে" একটা জোরালো উল্লাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঐ সব সংবাদমাধ্যম বাংলার বুকে সি পি আই (এম)-এর বিপর্যয়কে ভারতে বামেদের পতনের শুরু বলে ধরে নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেপরে মার্কিন সংবাদমাধ্যমে "ইতিহাসের মৃত্যু" ঘটেছে বলে যে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করা হয়েছিল, এই চিল চিৎকার তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এক দশকের যুদ্ধ ও বেশ কিছু বছরের নাছোড়বান্দা মন্দার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চর্চার বিষয়টা এক সম্ভাব্য মার্কিন বসন্তের পদধ্বনি নিয়ে গুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়েছে। সন্দেহ নেই, ভারতে "বামেদের অন্তর্জলি যাত্রা" সম্পর্কিত যে মতাদর্শগত প্রচারটা চলছে, দুর্নীতি ও কর্পোরেট লুটের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণবিক্ষোভের আবহাওয়ার সাথে সেই প্রচার একইরকম সঙ্গতিহীন বলেই মনে হবে।

বুর্জোয়াদের সোচ্চার বিজয়োল্লাসকে আমরা মেনে নিতে পারি না। তার সাথে সাথে, শাসক শ্রেণীর যে প্রজ্ঞা পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে যাওয়ার ধারণাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি পুঁজিবাদকে আরও মানবিক করে তোলার ধারণার সাথে একাত্ম সমাজগণতন্ত্রী হিসাবে নিজেদের নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় কমিউনিস্টদের পরামর্শ দেয়, তাকেও আমাদের নাকচ করতে হবে। কিন্তু সেইসাথে বামেদের ভবিষ্যৎ এবং বাম আন্দোলনকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য বাম শক্তিগুলির আবশ্যিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক মহলে যে একটা আন্তরিক উদ্বেগ রয়েছে, সেই বিষয়টাও আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ই পি ডবল্যু (ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি)-র পাতায় একটা উপভোগ্য বিতর্ক সামনে উঠে আসছে বলে মনে হচ্ছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস (টি এম সি)-এর হাতে সাম্প্রতিক ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে সুমন্ত ব্যানার্জীর এক অন্তর্দৃষ্টিমূলক রচনা ("পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী পাঁচ বছরকাল, এবং ভারতীয় বামেদের ভবিষ্যৎ", ই পি ডবল্যু, ৪ জুন, ২০১১) দিয়ে। ব্যানার্জী সি পি আই (এম)-এর মধ্যে পথ পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না এবং সি পি আই (এম) বহির্ভূত বামেদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে এক নতুন ভারতীয় বামের উত্থানের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন।

ব্যানার্জীর লেখাটি সি পি আই (এম)-এর পতন নিয়ে প্রভাত পটনায়ককে একটা তাত্ত্বিক নিবন্ধ ("পতনের পথে বামেরা", ই পি ডবল্যু, ১৬ জুলাই, ২০১১) লিখতে প্ররোচিত করেছে।

পট্টনায়ক স্পষ্ট যুক্তি দিয়েছেন যে, সি পি আই (এম) এক গভীরে বাসা বাঁধা "গতানুগতিক অভ্যাসবাদ" রোগে ভুগছে। এই গতানুগতিক অভ্যাসবাদ পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে যাওয়ার মৌলিক ধারণা ও বীক্ষার থেকে অনুশীলনকে সম্পর্কবিহীন করে তোলে এবং এর মধ্যে পার্টিকে বাম রাজনীতির রাস্তা থেকে পুরোপুরি বিপথে চালিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, 'গতানুগতিক অভ্যাসবাদ"-এর অধঃপাতমূলক দ্বান্দ্বিকতা কাটিয়ে ওঠার মত মতাদর্শগত সামর্থ্য সি পি আই (এম)-এর এখনও আছে এবং যদি সে তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার জায়গা নিতে পারে এমন একটা কমিউনিস্ট সংগঠন যার তাত্ত্বিক অবস্থান অনেকটাই সি পি আই (এম)-এর মতন।

প্রভাত পটনায়কের এক সংক্ষিপ্ত জবাবে হীরেন গোহাইঁ বিতর্কটাকে আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি সি পি আই (এম)-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতরে নিয়ে গেছেন ("বামেদের পতন ঃ এক সমালোচনামূলক মন্তব্য", ই পি ডবল্যু, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১)। গোহাইঁ মনে করেন, সংসদের প্রতি যে অ-বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী ধাপে ধাপে অঙ্গীভূত করার পথে নিয়ে যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংসদ-বহির্ভূত উদ্যোগগুলি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়াটাই সি পি আই (এম) -কে বুনিয়াদি শ্রেণীগুলির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। পার্টির নিজের স্বার্থ বুনিয়াদি শ্রেণীগুলির স্বার্থের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে জনগণের প্রতিবাদ বিক্ষোভগুলিকে বর্বরভাবে দমন করার পথে পার্টিকে নিয়ে গেছে, ঠিক যেমনটা সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে দেখা গেছে। এটাকে নিছক "গতানুগতিক অভ্যাসবাদ" বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

এই আলোচনায় ঢোকার আগে দেখে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সি পি আই (এম) নিজে পার্টিগতভাবে কি মূল্যায়ন করেছে। পর্যালোচনায় স্বীকার করা হয়েছে যে, পার্টি একটা বড় ধরনের পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে এবং তার জন্য একগুচ্ছ কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে, আর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, "... নয়া উদারনীতিক কাঠামোর বিকল্প নীতিমালা রূপায়ন করার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট কাজ করেছিল কি না তা যাচাই করতে আরও একটা বিস্তৃততর পর্যালোচনা করা হবে"। কিন্তু বাস্তবে ঐ পর্যালোচনায় আমাদের বিশ্বাস করাতে চাওয়া হয়েছে যে, সি পি আই (এম) যেহেতু নয়া-উদারনীতিক নীতিগুলির ও ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে, তাই সি পি আই (এম)-কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য শাসকশ্রেণীগুলির ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার চক্রান্তই এই পরাজয়ের জন্য মূলগতভাবে দায়ী এবং পরিবর্তনের জন্য জনগণের আকাঙ্খাটা জন্ম নিয়েছিল নিছকই সি পি আই (এম) শাসনের দীর্ঘ মেয়াদের দরুণ সৃষ্ট এক ক্লান্তি থেকে।

পটনায়কের লেখাটির সাথে সি পি আই (এম)-এর পার্টিগত মূল্যায়নের স্পষ্টতই ফারাক রয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্পর্কিত পথনির্দেশক ধ্যানধারণাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার মাশুলই সি পি আই (এম)-কে মূলগতভাবে দিতে হয়েছে। পটনায়ক যেখানে সি পি আই (এম) কর্তৃক বুনিয়াদি শ্রেণীগুলিকে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন, সেখানে সি পি আই (এম)-এর পর্যালোচনায় ভূমিসংস্কারের বিষয়টা তুলে পার্টির ও কৃষকশ্রেণীর একটা অংশের মধ্যে একটা

বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু পটনায়ক ও সি পি আই (এম) উভয়েই বাংলার এই বিপর্যয়ের প্রকৃত গুরুত্বটাকে খাটো করে দেখিয়েছেন এবং ভেতরকার মূল কারণগুলিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে না পারলেও গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এভাবে এই দুই মূল্যায়ন প্রকৃত পুনরুজ্জীবনের জন্য জরুরী শিক্ষাগুলির ওপর জোর দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

জমি ও স্বাধীনতা

পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর ওপর বস্তুনিষ্ঠভাবে নজর রাখছেন এমন যে কোন মানুষ এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, ২০১১ সালের ফলাফলটা ১৯৭৭ সালের ফলাফলের উল্টো দিক থেকে ঠিক পুনরাবৃত্তি। ১৯৭৭ সালে সি পি আই (এম) ক্ষমতায় এসেছিল জরুরী অবস্থায় জর্জরিত পশ্চিমবাংলায় মানুষের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আকাঙ্খার ওপর ভর করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বাংলার বুকে যে সব গণআন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল, ১৯৬০-এর দশকের শেষের মধ্যেই তার মূল সাংগঠনিক সুবিধাগুলি ভোগ করা শক্তি হিসাবে সি পি আই (এম) সামনে চলে আসে। কিন্তু ১৯৭৭ সাল দিয়েছিল তার সঠিক অর্থ খুঁজে নেওয়ার মুহূর্ত, আর পঞ্চায়েতীরাজ ও অপারেশন বর্গার মধ্যে দিয়ে সি পি আই (এম) নিজের অবস্থাকে সংহত করার পথে এগিয়ে যায়। জমি ও স্বাধীনতা যদি এভাবে বামফ্রন্ট শাসনের শুরুর দিকে সি পি আই (এম)-কে বিরাট গণভিত্তি দেওয়ার পিছনে দুই মূল ভিত্তি হয়ে থাকে, তবে ২০১১-র নির্বাচনেও জনগণের কাছে মূল ইস্যু হয়ে ছিল ঐ দুটো বিষয়ই। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন পার্টি-সরকার যন্ত্রের শ্বাসরোধকারী আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য ব্যাপক খোঁজ এবং জমি ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে কৃষকশ্রেণী ও গ্রামীণ গরিবদের একটা বড় অংশের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভই শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালে সি পি আই (এম)-এর কলঙ্কজনক বিদায় ডেকে আনে।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতটাই নিশ্চয়ই বামেদের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর উদ্বেগের আসল কারণ। বাংলায় দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে বুনিয়াদি শ্রেণীগুলির দিক থেকে বামেদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতা খোওয়ানোকে পুঁজি করে এবং গণতন্ত্র, জমি ও প্রকৃত জনকল্যাণের মৌলিক এজেণ্ডাকে কাজে লাগিয়ে। *মা-মাটি-মানুষ*-এর শ্লোগানকে সামনে রেখে মমতা ব্যানার্জী যেখানে মানুষের কাছে তাঁর আবেদনকে বাড়িয়ে নিয়েছেন ও সংহত করেছেন, সেখানে বাংলায় সি পি আই (এম)-এর নামটা যুক্ত হয়ে গেছে গণহত্যা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) ও টাটা ন্যানোর সঙ্গে! সমস্যার ভেতরকার এই সারবস্তুটার সরাসরি মোকাবিলা না করে কোন প্রকৃত আত্মানুসন্ধানই হতে পারে না। আর তাছাড়া সি পি আই (এম) নেতৃত্বকেই শুধু আত্মানুসন্ধান করলে হবে না, যে সব সি পি আই (এম)-পন্থী বুদ্ধিজীবী সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সি পি আই (এম)-এর নিন্দনীয় ভূমিকার সপক্ষে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে নিজেদের নিন্দনীয় করে তুলেছেন, তাঁদেরও কিছু আত্মানুসন্ধান করতে হবে।

এটা সুবিদিত যে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের মধ্যেকার প্রভাবশালী মতটি এই প্রকৃত সমস্যাটিকে সংশোধন করা তো দূরের কথা, তাকে স্বীকৃতি দিতে ও তা নিয়ে আলোচনা

চালাতে পর্যন্ত অস্বীকার করে এবং তার বদলে, কেন্দ্রে সি পি আই (এম) কি করতে পারল বা পারল না, তার ওপরই সব দায় চাপিয়ে খালাস পেতে চায়। ১৯৯৬ সালে জ্যোতি বসুকে কংগ্রেস সমর্থিত এক জগাখিচুড়ি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে দিতে সি পি আই (এম) -এর কেন্দ্রীয় কমিটির অস্বীকারকে যদি প্রথম "ঐতিহাসিক ভুল" বলে মনে করা হয়ে থাকে, তবে ২০০৮ সালে প্রথম ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালোয়েন্স (ইউ পি এ) সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়াটাকে দ্বিতীয় এ ধরনের ভুল বলে ধরে নেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয় যে, এই সমর্থন তুলে নেওয়ার ফলেই কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে নতুন করে ঐক্য গড়ে ওঠার পথ সুগম হয় এবং তার পরিণামে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর নির্বাচনী ভাগ্য রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই মনোগত ও দেউলিয়া চিন্তার ধরনের চাইতে বড় সত্যের অপলাপ আর কিছু হতে পারে না। যে কোনভাবেই হোক পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস কাছাকাছি আসতই। তাছাড়া কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে দেখা গেছে, কংগ্রেস আলাদাভাবে লড়লেও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানকে ঠেকানো যেত না। কিন্তু এই বিতর্ককে সমাধান করার কোন ইচ্ছা সি পি আই (এম)-এর নেই, আর তার পরিণাম হচ্ছে এমন এক পর্যালোচনা, যা পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর বিপর্যয়কে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শহীদত্ব বলে তুলে ধরতে চায়। এইভাবেই সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর তথা কেন্দ্রে তার ভূমিকার প্রকৃত সমালোচনামূলক যাচাইকে এড়িয়ে চলে।

প্রকৃত তথ্য দেখতে গেলে, প্রথম ইউ পি এ সরকারের মেয়াদের বেশিরভাগ সময় জুড়েই সি পি আই (এম) সরকারের সাথে সহযোগিতা করে চলেছে। ২০০৫ সালে সেজ আইন নির্বিবাদে পাশ করাতে দেওয়া হয়েছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে এক আলাপচারিতার সময় প্রকাশ কারাত সম্প্রতি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, কৃষকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে সি পি আই (এম) বিষয়টিকে বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁরা বিষয়টাকে অনেকটাই ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এটা অবশ্য অন্য ব্যাপার যে, এমনকি সেজগুলির মধ্যেকার শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেও আইনটি কম বিরোধিতাযোগ্য ছিল না। ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির ইস্যুতেও, সমর্থন তুলে নেওয়ার বিষয়টা ঘটনাক্রমে উদ্ভূত হয়েছিল পুরোপুরি এক পদ্ধতিগত বিরোধ থেকে এবং ততদিনে ভারত-মার্কিন রণনীতিগত অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা যথেষ্ট গতি পেয়ে গিয়েছিল।

সি পি আই (এম)-এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা

প্রভাত পটনায়ক প্রায়শঃই লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রসঙ্গ টানেন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে সি পি আই (এম)-এর কমিউনিস্ট পরিচয়ের নির্ধারক সবুদ বলে উল্লেখ করেন। লেনিনের তত্ত্বের সবচাইতে বড় গুণ ছিল এই যে, সাম্রাজ্যবাদকে তিনি পুঁজিবাদের নিজেরই এক কাঠামোগত বিকাশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা চালানো যুদ্ধ ও আগ্রাসী বৈদেশিক হস্তক্ষেপ নিছক এক বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল না এবং কূটনীতির কোন ব্যর্থতার

থেকেও নিশ্চিতভাবে তার জন্ম হয়নি, বরং তার শিকড় লুকিয়ে ছিল পুঁজির অন্তর্নিহিত সম্প্রসারণবাদী লিপ্সার মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের দেওয়া সংজ্ঞা বিচার করলে এটা পরিষ্কার হবে যে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে শুধুমাত্র ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি ও তাদের মধ্যেকার রণনৈতিক অংশীদারিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না—যে উদারনৈতিক নীতিগুলি কর্পোরেট লুটে মদত দিচ্ছে ও আমাদের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করছে, সেই সমগ্র নীতিমালাকেও তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এই আসল পরীক্ষায় সি পি আই (এম) কি ফলাফল করেছে? পারমাণবিক চুক্তি সম্পর্কে সি পি আই (এম)-এর অবস্থানকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি পটনায়ককে এটাও স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) নয়া-উদারনৈতিক অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ গড়ে তোলাতেই ব্যস্ত থেকেছে। একটা পার্টি যখন তার সবচাইতে শক্তিশালী দুর্গে বসে এটা করে, তখন অন্যত্র সেই একই নীতিগুলির প্রতি তার বিরোধিতার মধ্যে স্বভাবতই কোন আন্তরিকতা বা সারবস্তু থাকে না। আর এখন উইকিলিকস্-এর ফাঁস করা ভারত থেকে মার্কিন কূটনৈতিক দপ্তরের পাঠানো কেবল-বার্তা থেকে আমরা ভালভাবেই জানতে পারছি, পার্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের পারমাণবিক চুক্তি ও রণনৈতিক অংশীদারিত্বের প্রকাশ্যে নিন্দা করলেও, সি পি আই (এম)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কিভাবে ভারতের মার্কিন কর্তাব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন।

সাম্রাজ্যবাদকে নিছক তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি জানানোটাই লেনিনের কাছে যথেষ্ট ছিল না। লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টরা এক বিপ্লবী রণনৈতিক বীক্ষার দ্বারা নির্দেশিত ও তার সেবা করা সমগ্র একসারি বিপ্লবী কৌশল সূত্রায়িত করা ও তা অনুসরণ করার দ্বারা সংস্কারবাদী ও সমাজগণতন্ত্রীদের থেকে নিজেদের আলাদা হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে। এই বিপ্লবী অনুশীলন তার সবচাইতে বড় সফলতা রাশিয়ার বুকে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পেলেও, এই অনুশীলনের লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্র থেকে শুরু করে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাজ করা কমিউনিস্টরা।

কমিউনিস্ট ও সমাজগণতন্ত্রীদের মধ্যেকার পার্থক্যরেখার মূল বিষয়টা ছিল, সংসদীয় রাজনীতিতে কিভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে এবং নির্বাচনী বিজয়কে কিভাবে ব্যবহার করা হবে। বুর্জোয়া সরকারে অংশগ্রহণ করা ও বুর্জোয়াদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা সংক্রান্ত সমাজগণতান্ত্রিক তত্ত্বের বিপরীতে, স্থানীয় ও প্রাদেশিক স্তরের নির্বাচনে জেতা যে কোন ক্ষমতাকে কমিউনিস্টরা (বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে কমিউনিস্টদের সরাসরি বিজয়ের বিষয়টাকে স্পষ্টতই চূড়ান্তভাবে অসম্ভব বলেই মনে করা হত) শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কর্তৃত্বের সামগ্রিক বিপ্লবী বিরোধিতার ওতোপ্রোত অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

তার দীর্ঘ নির্বাচনী যাত্রাপথের একেবারে গোড়া থেকেই সি পি আই (এম) এই কমিউনিস্ট নীতি থেকে সরে এসেছে। ১৯৭৭-এ সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্টের উৎসাহদায়ী বিজয়ের

প্রেক্ষাপটে একমাত্র যে শ্লোগানটাই বাম কর্মীদের সবচাইতে মনে ধরেছিল সেটা ছিল, "বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার"। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সি পি আই (এম) উপলব্ধি করল যে স্থায়ী সরকারের একান্ত প্রয়োজনীয়তার সাথে এই শ্লোগান খাপ খাবে না। এভাবে শ্লোগানটিকে দ্রুতই তুলে নেওয়া হয় এবং তার জায়গায় নিয়ে আসা হয় "*বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের হাতিয়ার*"এই শ্লোগানটি। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও লালগড় ঘটার পরেপরে পশ্চিমবঙ্গের এক বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই সরকারকে আরও অধঃপতিত হওয়া "*উৎপীড়নের হাতিয়ার*" হিসাবে দেখতে পান।

পটনায়ক যদি সাম্রাজ্যবাদের বিপদের নিছক তাত্ত্বিক স্বীকৃতির প্রশ্নের বাইরে গিয়ে একটা কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলের বাস্তব জমি নিয়ে মাথা ঘামাতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন, ক্ষমতা ভাগাভাগির মধ্যে দিয়ে ত্রাণ ও সংস্কারের সমাজগণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে বেছে নিয়ে সি পি আই (এম) কিভাবে একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভেতরকার ক্ষমতার প্রশ্নটির প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। সি পি আই (এম)-এর ২০০০ সালের সময়োপযোগী কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারে ছোট শরিক হিসাবে পার্টির যোগ দেওয়া সংক্রান্ত ধারা ঢোকানো হয়। এটা ছিল পার্টির ১৯৬৪ সালের কর্মসূচীর বিখ্যাত ১১২ নং অনুচ্ছেদের থেকে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশক জুড়ে এবং সেই একেবারে ১৯৯৬-৯৮ পর্যন্ত, যখন সি পি আই নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেও সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিতে অস্বীকার করেন, এই ধারাটির দ্বারাই সি পি আই (এম) সি পি আই-এর সাথে নিজের পার্থক্যরেখা টেনেছে।

সংসদ সর্বস্বতা

সংসদীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত সি পি আই (এম)-এর নীতি এবং "গতানুগতিক অভ্যাসবাদ"-এর কক্ষপথের মধ্যেকার কোন সম্পর্ক পটনায়ক দেখতে পান না। তার বদলে, যাঁরা এই সম্পর্ক দেখতে পান তাঁদেরকে পটনায়ক অভিযুক্ত করেন নিজের আখ্যায়িত সংসদীয় অন্ধ সংস্কারবাদের শিকার বলে। এবার এটা একটা খুবই মজার ব্যাপার। পুঁজি সম্পর্কে অধ্যয়নকে গভীরে নিয়ে যেতে মার্কস পণ্যের অন্ধ উপাসনার বিরোধিতা করেছিলেন। পুঁজিবাদের পণ্য-অধ্যুষিত উপরিতল থেকে শুরু করে মার্কস পাঠকদের একেবারে উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের মৌলিক প্রশ্নটির মধ্যে নিয়ে যান। কিন্তু রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকে খুলে ধরতে ও বুর্জোয়া রাজনীতিতে আরও শক্তিশালী সর্বহারা হস্তক্ষেপের উপায় খুঁজতে আমাদের সংসদের চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যাওয়ার বদলে পটনায়ক সংসদীয় অন্ধ সংস্কারবাদ পরিশব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংসদকে বয়কট করেন ও অন্যান্য যাঁরা ঐ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে থাকেন। জনগণের রাজনৈতিক উদ্যোগ ও কল্পনাকে সীমিত করতে যাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংসদকে ব্যবহার করেন এবং অভ্যাসগতভাবে যাঁরা সবসময়ই সংসদের গরিমা ও অধিকারকে জনগণের অধিকার ও সংগ্রামের ওপরে স্থান দেন, তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনামূলক কোন কথা স্পষ্টতই তাঁর বক্তব্যে অনুপস্থিত।

তিনি সম্ভবত এই ঘটনা পুরোপুরি ভুলে গেছেন যে, "বয়কটপন্থীদের" ও বাম হঠকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে লেনিন সবসময়ই সংসদ সর্বস্বতার বিপদকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে আরও বড় বিপদ বলে মনে করতেন। প্রভাত পটনায়কের জবাবে, হীরেন গোহাইঁ সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই সংসদীয় কাজ ও সংসদ-বহির্ভূত কাজকে মেলানোর ক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-এর ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছেন এবং দক্ষিণপন্থীরা তাদের বহুমুখী সংসদ-বহির্ভূত উদ্যোগ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যে কল্পনা ও উৎসাহ (যদিও তা প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের) দেখায়, তার সঙ্গে সেটার তুলনাও টেনেছেন।

বস্তুত, চলমান দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে পটনায়কের নিজের বক্তব্যের মধ্যেই সংসদীয় অন্ধ সংস্কারবাদের জ্বলন্ত উদাহরণ লুকিয়ে রয়েছে। জন লোকপাল বিলের কাঠামো ও তার ধারাগুলি কিংবা তথাকথিত "টিম আন্না"-র সীমিত এজেণ্ডা ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা এক জিনিস, কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটাকে গণতন্ত্র ও সংসদের পক্ষে বিপদ হিসাবে তুলে ধরাটা পরিষ্কারভাবে সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয়। কলঙ্কিত বুর্জোয়া নেতৃত্বের সংসদীয় ঢালের আড়ালে লুকোনোর মরীয়া চেষ্টার ব্যাপারটা বোঝা যায়, কিন্তু সামাজিক রূপান্তর করতে নেমেছে যে শক্তিগুলি, তারা কেন জাগ্রত জনতাকে দেখে ভয় পাবে?

সংসদের সপক্ষে দাঁড়ানো ও "উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসন"-এর হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর নামে কমিউনিস্টদের কি জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি বিরোধী জাগরণের থেকে দূরে সরে থাকা উচিত, নাকি জনগণের ক্রোধকে কমিউনিস্টদের স্বাগত জানানো উচিত এবং কর্পোরেট লুটের ও জনগণের অধিকার দিতে অস্বীকার করা সমগ্র জমানাটার বিরুদ্ধে তাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা উচিত?

বামেদের সামনে যে পথ রয়েছে তা স্পষ্টতই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ভিত্তিতে বাম শক্তিগুলির এক বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাসের পথের মধ্যে দিয়েই যাবে। নয়া-উদারবাদী নীতিগুলির দু দশকব্যাপী আধিপত্যের শেষে জনগণের প্রায় সমস্ত অংশই এই নীতি সম্পর্কিত জমানার বিপর্যয়কর পরিণামের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আমাদের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র সম্পর্কিত বুনিয়াদি সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপক চর্চা ও বিতর্ক চলছে। দক্ষিণপন্থীরা যেখানে এই বাতাবরণকে নিশ্চিতভাবেই নিজের অনুকূলে ব্যবহার করে নিতে চাইবে এবং উদারপন্থীরা নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখবে কেবলমাত্র অগভীর ও ওপর ওপর সংস্কারের মধ্যেই, সেখানে লড়াইগুলিকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে ও আরও বড় পরিধিতে ছড়িয়ে দিতে এবং সেগুলিকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে বামেদের অবশ্যই এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বামেরা যত জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে নিজেদের একাত্ম করে নেবে, ততই বাম পুনর্জাগরণের অনুকূলে আরও বেশি গতির সৃষ্টি হবে। আর সেটাই কেবলমাত্র বামেদের "পতন" নিয়ে এই বিতর্কের প্রকৃত সমাধান হতে পারে।

(ই পি ডব্লিউ, ১৯ নভেম্বর ২০১১ সংখ্যা থেকে)

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রায় এবং তারপর

।। অরিন্দম সেন।।

রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এবং গতানুগতিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল যে রাজ্য সেখানে পরিবর্তনের পক্ষে উচ্চকিত ও স্পষ্ট নির্বাচনী রায়কে সঠিকভাবেই ১৯৭৭ সালের বিপরীত পুনরাবৃত্তি বলে দেখা হয়েছে। সে বছরে সি পি এম এবং তার মিত্ররা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এরকমই উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করেছিল। এখন সেই কংগ্রেস ও তার থেকে উদ্ভুত তৃণমূল কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় গেঁড়ে বসা দলটির শাসকদের পাশা উল্টে দিয়েছে। এবারের মত সেবারেও বিজয়ের পেছনে ছিল গণতন্ত্রের আবেগ—সত্তর দশকের প্রথম দিক থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে লাগাতার ছয় বছর ধরে চলা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতার পর যার একটা বিশেষ আবেদন ছিল এই রাজ্যে। তবে এখানেই মিলের শেষ। ২০১১-র রায়ের পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত আলাদা এবং তা সম্পূর্ণ পৃথক এক সম্ভাবনাকে তুলে ধরে।

প্রথম স্ফুলিঙ্গ এবং দাবানল

মে মাসের শেষদিকে যখন সংসদীয় বাম শিবির বিপুল সাফল্যে (৮০ শতাংশ আসনে জয়ী আর তৃণমূল মাত্র ১০ শতাংশ) বুঁদ হয়ে ছিল, সেই সময় সিঙ্গুরে আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিতকর এক কৃষক প্রতিবাদ, যাদের শোনার জন্য কান এবং দেখার জন্য চোখ আছে তাদের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠালো। উপযুক্ত রাজনৈতিক হোমওয়ার্ক না করেই এই ধরনের একটি সংবেদনশীল বিষয়ে তড়িঘড়ি নেমে পড়ার জন্য জ্যোতি বসু তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে সরকারের সমালোচনা করলেন। বোঝাই যাচ্ছিল, লক্ষ্যবস্তু ছিলেন প্রধানত মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রধান শাক্‌রেদ শিল্পমন্ত্রী। আর আমরা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলের প্রথম বিশ্লেষণেই বললাম, বিপুল সাফল্য "ব্যবস্থার ব্যর্থতার যে অশনি সঙ্কেত বহন করে আনে তা হয়তো আর বেশি দূরে নেই"। ("সাফল্য যখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়" — লিবারেশন, জুলাই ২০০৬)

রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠতে লাগল এবং ২০০৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরে জমায়েত হওয়া সংগ্রামী পুরুষ ও মহিলা জনতার সামনে সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক আরও স্পষ্টভাষায় বললেন, "যদি সিঙ্গুরে রক্ত বয়ে যায় তবে তা কলকাতায় সি পি আই (এম)-এর ক্ষমতার আসনকে ধুয়ে সাফ করে দেবে"। রক্ত ঝরেছে—সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে, লালগড়ে এবং আরও অনেক জায়গায়, যা জনগণের প্রতিরোধের শক্তিশালী ঢেউয়ের জন্ম দিল। নন্দীগ্রাম পার হওয়ার সময় তা পরিণত হল সুনামিতে। ২০০৮-এর শুরুতে পঞ্চায়েতের 'দুর্ভেদ্য' প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিল, পরবর্তী সুরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল পরের বছরে সংসদীয় নির্বাচনের সময়, তারপর কলকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য শহরগুলোর পৌর নির্বাচনে ঘটল

বিপর্যয়কারী পরাজয় এবং সবশেষে মহাকরণের ক্ষমতাও গেল।

এমন নয় যে জনগণের ক্ষোভের কারণ শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের দমনমূলক পদক্ষেপ। রয়েছে আরও শতশত ক্ষোভ ঃ জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমিকা সারা দেশের মধ্যে জঘন্যতম; সেচ, বিদ্যুতায়ন, শস্যগোলা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ—এই সবকিছুতে গাফিলতি, আরও অন্যান্য বিষয় যেমন চাষিদের সুলভে ঋণ ও লাভজনক দাম পাওয়ার বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা; শিল্পের রুগ্নতা ও বেকারি সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রচেষ্টার অভাব; বি পি এল কার্ডের ব্যাপারে এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীনতা ও দুর্নীতি; "পার্টি-রাষ্ট্র সিনড্রোম" বা জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক বা এমনকি ব্যক্তিগত বিষয়েও "স্বাভাবিক শাসক"দের বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এত বছর ধরে সে সব সহ্য করে এসেছেন এই ভেবে যে, সম্ভবপর বিকল্প—তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার তা সে একক হোক বা কংগ্রেস অথবা বিজেপির সাথে আঁতাত করেই হোক—উন্নততর কিছু করে দেখাতে পারবে না। সুতরাং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরা বারে বারে বামফ্রন্টকেই ফিরিয়ে এনেছেন।

সিঙ্গুর পরবর্তী ঘটনাবলী—নন্দীগ্রাম, রিজওয়ানুর রহমান ও তার পরিবারের প্রতি নগ্ন অবিচার, এন আর ই জি এ-র অধীনে কাজের দাবিতে আন্দোলনকারী দিনহাটার গরিব জনতার ওপর পুলিশী গুলিচালনায় পাঁচ জনের হত্যা, 'মাওবাদী বিপদ'-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে লালগড়ের আদিবাসী জনগণ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর দমনপীড়ন—জনগণের এই মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাংলার মানুষ যেন একসুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—যথেষ্ট হয়েছে! এই বিশ্বাসঘাতকদের দল, এই উদ্ধত স্বৈরাচারীদের দলকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে, তাতে যা হয় হোক। এই একবারের জন্য, দীর্ঘ ৩৪ বছর পর আসা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য জনগণ বর্তমান সরকারের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে চিন্তাভাবনা থামিয়ে রাখলেন। জনগণ গর্জে উঠলেন, "আগে এ সরকারকে হঠাও, তারপর দেখা যাবে কি হয়।" জনমনের এই আমূল পরিবর্তন, এই একক উদ্দেশ্য শ্রেণী, বর্ণ ও ধর্মনির্বিশেষে বাংলার জনগণকে গ্রাস করে ফেলে ২০১১-র নির্বাচনের ফলাফলকে নির্ধারণ করে দিল।

১৩ মে গণরায়ের তাৎপর্য

জনগণের সাম্প্রতিকতম রায় তাই প্রধানত বিগত পাঁচটি বছর ধরে চলা গণআন্দোলনের প্রতিফলন। এটি এমন এক ঘটনা—ইতিহাসে এমন আরও অনেক উদাহারণ আছে—যেখানে জনগণের প্রতিবাদ এবং জনগণের জয়কে জনগণের বিরোধী শক্তিগুলো দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে নিল, সাময়িকভাবে হলেও তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারল। সি পি আই (এম) কখনই এই যোগসূত্র বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলোকে বুঝতে পারবে না; আমাদের তা অবশ্যই বুঝতে হবে।

গ্রামে গ্রামে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সবুজ প্রান্তরে, কলকাতা ও অন্যান্য শহরের রাজপথ ও

অলিগলিতে, জঙ্গলমহলের বনভূমি এবং কুঁড়েঘরে যে সংসদ বহির্ভূত গণআন্দোলনের বিপুল বিস্ফোরণ ঘটল, সেটাই নির্মাণ করে দিল সেই ভিত্তিভূমি, যার ওপর গড়ে উঠল একের পর এক নির্বাচনী লড়াই—পঞ্চায়েত, লোকসভা, পৌর নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন—যাতে শাসক পার্টি উপর্যুপরি পরাজিত হল। মমতা ব্যানার্জীর অসাধারণ বিজয়ের কারণ হল তিনি অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে সর্বাপেক্ষা উজ্জীবিত এবং সর্বদাই সবার আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ার মত নেতৃত্ব হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি দীর্ঘকালব্যাপী ঝিমিয়ে পড়া সমগ্র কংগ্রেস শিবিরকে শুধুমাত্র উজ্জীবিতই করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বামেদের একটা অংশের সঙ্গেও এক নতুন মৈত্রী গড়ে তুললেন—যেমন বিক্ষুব্ধ সি পি এমের একটা অংশ, এস ইউ সি-র মত পার্টি এবং মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকজন। হতাশাগ্রস্ত ও কলঙ্কিত সি পি এম শিবিরের নিজেদের বাঁচানোর শেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই নতুন জোট তার ওপর নির্ধারকভাবে বিজয়ী হল।

সি পি আই (এম এল) এবং কয়েকটি অন্য বামগোষ্ঠী (কয়েকটি অন্য এম এল গোষ্ঠী, পশ্চিম মেদিনীপুরে সি পি এম থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামে যারা নির্বাচনে লড়েছেন, মজদুর ক্রান্তি পরিষদ এবং অবশ্যই লালগড় আন্দোলনের নেতা ছত্রধর মাহাতো যিনি তৃণমূলকে হতবাক করে দিয়ে জেল থেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রবল বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে স্বল্প প্রচার চালিয়েও ২০০০০ ভোট পেয়েছেন) ছিল ব্যতিক্রমী যারা সংগ্রামী জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং তৃণমূলের জোয়ারে ভেসে যেতে অস্বীকার করেছিল। সি পি আই (এম এল) মোট ৭১০০০ ভোট পেয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এস ইউ সি-র একেবারে বিপরীতে এ হল সংগ্রামী বামেদের এক স্বাধীন ও সাহসী পদক্ষেপ। এই পার্টিটি তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে ১২টি আসন চেয়ে মাত্র ২টি আসন পায় এবং তার মধ্যে একটিতে পরাজিত হয়। তীব্র আন্তঃপার্টি লড়াইয়ের ফলে তাদের নেতৃত্ব পরপর দুদিন সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হয়। প্রথম দিন নতুন সরকারে যোগ না দেওয়ার ঘোষণা এবং দ্বিতীয় দিন জোট থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা।

বহুচর্চিত স্থায়িত্বের ভিত্তি

১৯৭৭ সালে সি পি এম তার সামাজিক ভিত্তির বিস্তার ঘটানোর জন্য নতুন করে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের সাহায্যে সুযোগ সুবিধা বিতরণ এবং সংস্কারের ওপরই নির্ভর করেছিল। আর বামফ্রন্ট সরকার প্রথমদিন থেকেই জোর দিয়েছিল মধ্যপন্থা ও শ্রেণীশান্তির ওপর।

এই সরকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার কর্মসূচী ছিল অপারেশন বর্গা এবং পঞ্চায়েতী রাজ। এই দুয়ে মিলে বৈরীমূলক শ্রেণীস্বার্থের সমঝোতার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন বলে

পরিচিত মধ্যবর্গকে গ্রামীণ বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে এবং বামফ্রন্ট সরকারের জন্য এক বিস্তৃত ও টেকসই সামাজিক ভিত্তির জোগান দিয়েছে। অপারেশন বর্গার পরবর্তী যুক্তিসম্মত পদক্ষেপ হতে পারত বর্গাদারদের হাতে জমির মালিকানার হস্তান্তর এবং তার ফলে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর মূল শ্লোগান "লাঙ্গল যার জমি তার" কার্যকরী করা যেত। কিন্তু জ্যোতি বসু ও তাঁর সহযোগীরা সেই পথ ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেলেন শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির আশঙ্কায়। মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়ে অপারেশন বর্গা তার গতি হারিয়ে ফেলে এবং ১৯৮০-র দশকের শেষভাগে এসে ভূমিসংস্কারের উল্টোযাত্রা শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতীরাজ তার নিজস্ব কায়েমী স্বার্থের জন্ম দিয়ে ফেলেছে এবং বেশী বেশী করে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী দলতন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতায় আসার মাত্র দু-বছরের মধ্যে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকারের অপর একটি স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। সেখানে বসতি স্থাপনের চেষ্টায় রত বাংলাদেশী শরণার্থীদের উৎখাত করার এক নিষ্ঠুর অভিযান চালানো হয়। সেই অত্যাচারের মাত্রা ছিল পরবর্তীতে নন্দীগ্রামে যা যা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশী। সকালেই বোঝা গিয়েছিল দিনটা কেমন কাটবে—দেখা যাবে আন্দোলনরত শ্রমিক (১৯৭৯ সালে একদিনেই কলকাতায় পুলিশের গুলি চালনায় ৬ জন ডক শ্রমিকের মৃত্যু) ও কৃষক এবং অন্যান্যদের ওপর সমগ্র বামফ্রন্ট জমানাব্যাপী নৃশংস পুলিশী অত্যাচারের ঘটনাবলী। জ্যোতিবাবু যে বার্তা দিতে চাইছিলেন তা ছিল আরো কঠোর এবং সোজাসাপ্টা ঃ "জনগণের সরকার-এর" বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের গুরুতর বিরোধিতাকে তৎক্ষণাৎ এবং কঠোরভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় ধাঁচের সমাজগণতন্ত্রী শাসন গড়ে তোলা হয়েছে শ্রেণীসংগ্রামের বদলে শ্রেণী সমঝোতার ওপর ভিত্তি করে এবং তা জঙ্গী গণআন্দোলনের বিপরীতে সরকারের স্থায়ীত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সংস্কার কর্মসূচী ছাড়াও বামফ্রন্ট সরকারের গণভিত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে একটি কাকতালীয় ঘটনায় যাকে সে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিল, তা হল—পূর্ব ভারতের ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের বিস্তার। এর ফলে বর্ধিত উৎপাদন হার (দীর্ঘকালীন ফলাফল যাই হোক না কেন) ধনী ও মধ্য চাষিদের ভালমাত্রায় উপকৃত করেছে। গরিবদের মধ্যেও তার একটা চুঁইয়ে পড়া সুবিধা এসে পৌঁছেছে। এইভাবে গড়ে ওঠা এক বিস্তৃত সমর্থনভিত্তি এবং সুবিন্যস্ত দক্ষ পার্টি সংগঠন—এই দুই স্তম্ভই হয়ে উঠেছিল বামফ্রন্ট সরকারের প্রবাদে পরিণত হওয়া স্থায়িত্বের এবং অপরাজেয়তার চাবিকাঠি।

কিন্তু এরকম কেন হল যে শাসকশ্রেণী ১৯৫০-এর শেষের দিকে কেরালা বা ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে পশ্চিমবাংলার মত এবারের এই সরকারকে অস্থিরতায় নিমজ্জিত করার বা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল না? বস্তুতঃ এরকমই আশঙ্কা গোড়ার বছরগুলোতে সি পি এম করে আসছিল, বিশেষ করে ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার পরে। ক্রমে ক্রমে

এটা বোঝা গেল যে, শাসকরা একই পুরানো কায়দা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় মনে করছিল না। এর পিছনে অন্ততঃ দুটি কারণ কাজ করেছে।

প্রথমত, যেভাবে ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে তথাকথিত নকশালপন্থী আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীকে নামিয়েছিল, তাতে ক্ষমতাসীন সি পি এমের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র ইতিমধ্যেই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। প্রধানত এই ভিত্তির ওপরেই জ্যোতি-সিদ্ধার্থ-ইন্দিরা আঁতাত গড়ে উঠেছিল। যার জন্য একমাত্র জ্যোতির্ময় বসু ছাড়া আর কোন সি পি এমের বড় নেতাকে জরুরী অবস্থার সময় জেলে যেতে হয়নি, যেখানে অনেক বুর্জোয়া বিরোধী পক্ষের নেতাদের বন্দী করা হয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে একটা লেনদেনের ব্যাপার ছিল ঃ জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সি পি এম তেমন উল্লেখযোগ্য কোন লড়াই গড়ে তোলেনি এবং পরবর্তীকালে পার্টির নিজস্ব স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, সেসময় তারা অসংগঠিত অবস্থায় ছিলেন। তাই ১৯৭৭-এর অনেক আগেই পার্টি (সি পি এম) সর্বোচ্চ স্তরে কংগ্রেসের বিশ্বাসভাজন এবং শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক আস্থাভাজন হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মত বামফ্রন্ট সরকার শ্রেণী সংগ্রামের কোন ফসল ছিল না এবং গণ জঙ্গী আন্দোলনের পরিমণ্ডলে কাজ করেনি। আমরা আগেই দেখেছি, সি পি এম সামগ্রিকভাবে এবং দৃশ্যত নরম মেরে গিয়েছিল যার মধ্যে আগেকার বছরগুলোর জঙ্গী অর্থনীতিবাদের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধী মধ্য সত্তরের কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন এক নতুন ও উন্নততর রণনীতি নিয়ে ঃ দেশের সবচেয়ে বড় বামদল (তার সহযোগীবৃন্দ সহ)-কে সংসদীয় পরিধির মধ্যে কাজ করতে দাও কিন্তু লাগাতার চাপের মধ্যে রাখো এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূত করে নাও। এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত পলিসি পরিবর্তন—যেটা কেন্দ্রের প্রতিটি পরবর্তী সরকার অনুসরণ ও উন্নত করে গেছে, সেটা ব্যতীত বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘতম সময় ধরে চলা "কমিউনিস্ট সরকার"-এর 'বিশ্ব রেকর্ড' করা সম্ভব হত না।

শ্রেণী সমঝোতা থেকে আত্মসমর্পণ

কিন্তু কেন এবং কিভাবে এবারে সেই "সুদৃঢ়" স্থায়ীত্ব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে তিন বছর ধরে আলিমুদ্দিন স্ট্রীট এবং এ কে জি ভবনের নেতারা একই সুরে গেয়ে চলেছেন যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কিছু পদ্ধতিগত ভুল, ক্যাডারদের একাংশের ঔদ্ধত্য, শাসক পার্টির মধ্যে কিছু কায়েমী স্বার্থ ও বদলোকের অনুপ্রবেশ, এখানে সেখানে কিছু দুর্নীতির ঘটনা ইত্যাদি কারণই এই অবস্থার জন্য দায়ী। একইসঙ্গে তারা দাবি করছেন যে এক জোরদার শুদ্ধিকরণ অভিযান চলছে এবং চালানো হবে এইসব সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য। এটা ছিল একটা হাস্যকর দাবি যা তাদের নিজেদেরই হাসির খোরাকে পরিণত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের আত্মসমালোচনা কখনই ততটা গভীরে পৌঁছায় না যেখানে বিচ্যুতি

এবং অধঃপতনের জন্য দায়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো উন্মোচিত হতে পারত। উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে যে বড় বড় উপদেশাবলী দেওয়া হয়েছিল, যেগুলো বাম শিবিরের মধ্যকার উদারনীতিবাদী নেতারা প্রায়শই আওড়াতেন—যেমন 'পরিবর্তিত হও নয় ধ্বংস হও'—সেসবও সমানভাবে মূল্যহীন।

কি ধরনের পরিবর্তনের কথা উপরোক্ত বক্তব্যে বলতে চাওয়া হয়েছে? স্পষ্টতই, বামপন্থী সমস্ত চিন্তাভাবনাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তভাবে নয়া-উদারনীতিবাদী মতাদর্শ ও রাজনৈতিক অর্থনীতিকে গ্রহণ করতে হবে, যাকে আজকের দিনের "ইন থিং" বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু "ব্র্যাণ্ড বুদ্ধ" শুধুমাত্র এর জন্যই খ্যাত হয়নি। বহুজাতিক কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও কর্পোরেটাইজেশনের উদ্দেশ্যে ম্যাকিন্সের সুপারিশ লাগু করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর সমস্ত ধরনের প্রতিবন্ধকতা জারি করা থেকে শুরু করে টাটা মোটরস ও সালিম ইন্টারন্যাশনালদের নির্লজ্জ তোষণ এবং সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে চরম অত্যাচার চালানো—বামফ্রন্ট সরকার তার শেষ বছরগুলোতে পরিপূর্ণভাবে বৃহৎ পুঁজির ম্যানেজারের মত আচরণ ও কাজ করে গিয়েছে। তার চিরাচরিত ভোটব্যাঙ্ক শ্রমিক ও কৃষকদের থেকে সি পি এমের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ নিহিত রয়েছে এখানেই। এমনকি বহুকথিত ঔদ্ধত্য এবং অন্যান্য বুর্জোয়া বদগুণাবলী হল দশকের পর দশক ধরে তলে তলে পার্টির সামাজিক ভিত্তি ও শ্রেণী মতাদর্শের যে পরিবর্তন ঘটে চলেছিল তার অপরিহার্য ও বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। এর থেকে বোঝা যায় দুর্নীতি এত সর্বব্যাপী কেন এবং হয়তো এটাও যে, সাধারণভাবে ভদ্রলোক সি পি এম নেতারাও দৈনন্দিন আচরণে এত উদ্ধত কেন।

অবশ্যই এই রূপান্তর দু-একদিনে হয়নি। প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯৮০-র দশকের শেষ দিক থেকেই, যখন সি পি এম তার নিজস্ব উপলব্ধির পরিবর্তন করে ফেলে—পার্টির নেতৃত্বে "উত্তরণশীল সরকার" (শ্রমজীবী জনগণের জন্য এক বিনম্র সুবিধা দান ও জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি) থেকে স্থায়ী ও দায়িত্বশীল সরকার (শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের থেকে উৎকর্ষ দেখানোর দায়বদ্ধতা) হিসাবে কাজ করা এবং সেইমত একগুচ্ছ পলিসি পরিবর্তনের সূচনা করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর জোর দেওয়ার আগের কর্মসূচীর জায়গায় নিয়ে আসা হল যৌথ (পাবলিক-প্রাইভেট) ক্ষেত্রে শিল্পায়নের নীতি ১৯৮৫ সালে সি পি এমের দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে। ১৯৯৪ সালে রাজ্য সরকার এক নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করে যা ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর প্রতিচ্ছবি। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় এস ই জেড আইন পাশের আগেই ২০০৩ সালে রাজ্যস্তরে এস ই জেড আইন পাশ হয়েছিল ... এইভাবে চলে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। মূলগতভাবে এ যাত্রা ছিল প্রধানত জনমুখী সংস্কার থেকে নয়া উদারনৈতিক সংস্কারের দিকে, শ্রেণী সমঝোতা থেকে আত্মসমর্পণের দিকে। সুতরাং গল্পটার নীতিবাক্য হল "পরিবর্তিত হও

নয়তো ধ্বংস হও" নয় বরং "পরিবর্তিত হও এবং ধ্বংস হও", যেখানে পরিবর্তন অর্থ হল পার্টির মতাদর্শ ও কৌশলগত লাইনের নয়া উদারনৈতিক পুনর্গঠন।

অবশ্যই, 'পরিবর্তন'-এর অর্থ হতে পারত মৌলিক দিশার সংশোধন যা হয়তো সি পি এমকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু পার্টির কর্মসূচীতে এটা কখনও স্থান পায়নি, আর এখনও পাচ্ছে না। বিপরীতে আবদুর রেজ্জাক মোল্লার মত কেউ যদি এ ব্যাপারে কোন সামান্য ইঙ্গিতও করেন, তাঁকে সেন্সর করে দেওয়া হয় এবং যথাসম্ভব তাঁকে প্রান্তিক করে দেওয়া হয়। এই মনোভাবের ফলে বেশী বেশী মানুষের কাছে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, ভারতবর্ষে বাম আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে সি পি এম-বামফ্রন্ট কাঠামোর বাইরে গিয়ে তা করতে হবে এবং তা করতে হবে বামপন্থীদের মধ্যকার সমস্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী শক্তিদের যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা নির্মিত লড়াকু বাম বিকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে।

এক বাম পুনরুজ্জীবনের—এক সংগ্রামী বাম বিকল্পের লক্ষ্যে

এ ঘটনাকে আমরা স্বাগত জানাই যে, জনগণের রায় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং জোরালো, কোনরকম অস্পষ্টতা নেই, দ্বিধাহীন। মার্কসবাদীরা সর্বদাই মাঝামাঝি সমঝোতার পরিবর্তে নির্ধারক ফলাফলই পছন্দ করে, কারণ তা শ্রেণী সংগ্রামের অবয়বকে স্পষ্ট করতে এবং যুদ্ধ রেখাকে স্পষ্ট ও নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মাঝামাঝি সমঝোতার ফল ঐ রেখাকে অস্পষ্ট করে দেয়। শ্রেণী সমঝোতার অসংশোধনীয় সমাজগণতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদ শেষ বিচারে শ্রেণী সংগ্রামের শক্তিগুলোকে মুক্ত করে দেবে। রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বর্তমান ভারসাম্য অনুসারে এই উচ্ছেদ যেভাবে ঘটা সম্ভব ছিল সেভাবেই ঘটেছে এবং এতে প্রকৃত মার্কসবাদীদের আশাহত হওয়ার কোন কারণ নেই, আবার আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ারও কোন কিছু নেই। আমাদের দুটি ক্ষেত্রে—যারা পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত—কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

উদ্ধত স্বৈরাচারী জমানাকে উৎখাতের জন্য জনগণের সংগ্রামের ফসল যারা আত্মসাৎ করল তাদের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য আমাদের স্বাগত জানাতে হবে গণতন্ত্র, মর্যাদা ও উন্নয়নের জন্য পুনর্জাগরিত জনগণের প্রতিজ্ঞাকে এবং কাজ করতে হবে সেগুলোকে ধরে। শুরুতে, আমরা নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলোকে ধরতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মন্ত্রীসভার একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষিদের ৪০০ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে আমাদের পার্টি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট এবং ন্যায্য প্রস্তাব সূত্রবদ্ধ করেছে। যেমন, সরকার শুধু জমিই ফেরত দেবে না, ঐ জমিকে চাষযোগ্য করে দিতে হবে, জমি অধিগ্রহণের ফলে যাঁরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, (তাঁদের মধ্যে নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত বর্গাদার এবং স্থানীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল ভূমিহীন ক্ষেতমজুররাও আছেন) তাদের সকলকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে; যেহেতু জমি অধিগ্রহণ পদ্ধতিটাই ছিল একতরফা,

খেয়ালখুশিমত এবং অন্যায্য, তাই বাকী ৬০০ একর জমির মালিকদেরও আর একটা সুযোগ দিতে হবে। একইভাবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে সমস্ত গণহত্যা সংঘটকদের অভিযুক্ত করা ও শাস্তিদানের জন্য, কালাকানুনে অভিযুক্ত ও আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং আন্দোলনকারীদের ওপর যে সমস্ত মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে তা তুলে নেওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। একইসঙ্গে আমাদের জনগণের মধ্যে প্রচার কাজকে জোরদার করতে হবে এবং ব্যাপক বাম শক্তিগুলোর সঙ্গে ধৈর্য ধরে ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য যেতে হবে, যাতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে এবং কি করতে হবে এ বিষয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ বোঝাবুঝিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত সম্ভবপর উপায় ও ফোরামগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

এই সময়ে যা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হল বাংলার রাজনীতির প্রকৃত গতিপ্রকৃতি নির্বাচনী ফলাফলকে ছাড়িয়ে অনেক দূরগামী। পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতাকে আমাদের আত্মস্থ করতে হবে বেশ কিছু (প্রায়শই পরস্পরবিরোধী) স্তর সমন্বিত সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া হিসাবে। মেকী বাম জমানার ভারি শব হঠানোর পর ভারতবর্ষের বাম আন্দোলনের সামনে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে, এক নতুন অধ্যায় যা সি পি এমের মধ্যকার সৎ ও চিন্তাশীল অংশের লোকজন সহ সমস্ত প্রকৃত বামপন্থী শক্তিগুলোর বৃদ্ধি ও কাছাকাছি আসার যথেষ্ট সুযোগ হাজির করেছে। আসুন, আমরা এই সম্ভাবনাকে কার্যকর করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।

(লিবারেশন, জুন ২০১১ সংখ্যা থেকে)

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের বিপর্যয় এবং ভারতীয় বামপন্থীদের সামনে উঠে আসা চ্যালেঞ্জ

২৮-২৯ মে, ২০১১ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে প্রকাশিত
সারা ভারত বাম সমন্বয়ের বিবৃতি

পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বিরাট পরাজয় ভারতবর্ষে বাম আন্দোলনের সামনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে এসেছে। এই ঘটনা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকেই কেবল সামনে তুলে ধরেনি, বরং নিষ্ঠাবান বামপন্থী শক্তির কাছে আরও বেশি বেশি করে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও জরুরী কাজগুলোকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে হাজির করেছে।

একদিকে যখন তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আঙ্গিনার পাদপ্রদীপে চলে এসেছে, তখন ভারতীয় শাসক শ্রেণীর দুই প্রধান সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেস ও বিজেপি এবং তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর রং-বেরঙের তাত্ত্বিক ও সংবাদ মাধ্যমের বিশ্লেষকেরা সি পি আই (এম)-এর এই নির্বাচনী বিপর্যয় ও রাজনৈতিক সংকটে উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। অনেকেই আবার এই বিপর্যয়কে ভারতে বাম আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই বিপর্যয়কে কমিউনিস্ট ধ্যানধারণার এই মান্ধাতার আমলের আপ্তবাক্য, অতীতের অপ্রাসঙ্গিক ধ্বংসাবশেষ হিসাবে ব্যাখ্যা করে সবাইকে পুঁজিবাদী আধিপত্য এবং বর্তমানের নয়া উদারনৈতিক জমানা ও মার্কিনপন্থী নীতিগুলোকে বরণ ও উদ্‌যাপন করার পরামর্শ দিচ্ছেন, যা ইতিমধ্যেই দেশকে নিমজ্জিত করেছে সার্বিক সংকটের পাঁকে।

সারা ভারত বাম সমন্বয় (যা দিল্লীতে ১১ আগস্ট, ২০১০-এ অনুষ্ঠিত এক কনভেনশন মারফত গড়ে ওঠে এবং যা সংগঠিত হয় সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সি পি এম পাঞ্জাব, লাল নিশান পার্টি (লেনিনবাদী) মহারাষ্ট্র এবং কেরলের বাম সমন্বয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে) বুর্জোয়াদের এই তারস্বর জয়োল্লাসে কর্ণপাত না করে জনগণকে শাসকশ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কারসাজি সম্পর্কে সজাগ থাকার আবেদন জানাচ্ছে, যা ইতিমধ্যেই জনগণের বিরুদ্ধে, তাদের সম্পদ, অধিকার,

জীবনজীবিকা এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বামপন্থীরা আজকের দিনে অপ্রাসঙ্গিক এবং একমাত্র সমাজগণতন্ত্রী রাজনীতির মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে—বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই প্রচারকে নস্যাৎ করতে হবে। সমস্ত প্রকৃত বামপন্থী কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সেই সমস্ত কারণগুলোকে গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করা জরুরী যার মধ্যে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের পতন নিহিত এবং সেখান থেকে দেশজোড়া বামপন্থী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে প্রকৃত শিক্ষা। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর তরফ থেকে নতুনভাবে ধেয়ে আসা বাম বিরোধী রাজনৈতিক-মতাদর্শগত আক্রমণের বিরুদ্ধে পুনরুজ্জীবিত বাম আন্দোলনই এক এবং একমাত্র সমুচিত প্রত্যুত্তর হতে পারে।

সি পি আই (এম) নেতৃত্ব যতই দাবি করুক না কেন, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের পরাজয়কে কখনই কেরলে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ-এর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, যেখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শেষোক্ত রাজ্যটিতে পালাবদল হওয়াটাই এক স্বাভাবিক রাজনৈতিক ঘটনা। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কেরলের নির্বাচনী ফলাফলের এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই পার্থক্যটা খুবই প্রকটভাবে সামনে চলে আসে। কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ জোট কান ঘেঁষে মাত্র চারটি আসন বেশি পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে। আর, পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম)-এর আসন সংখ্যা ১৯৬৭ সালের প্রাপ্ত আসন থেকেও কম, দুটি জোট সরকারের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের পার্থক্য ৩০ লক্ষেরও বেশি।

এটা ঠিক যে এবারের মরণপণ নির্বাচনী লড়াইয়ে সি পি আই (এম) তাদের গোটা নেটওয়ার্ককেই চাঙ্গা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, আর ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় প্রায় ১০ লক্ষ বাড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লজ্জাজনক হার স্পষ্টতই পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম) শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষকেই দেখিয়ে দেয়, যা কার্যত রূপান্তরিত হয় এক নির্বাচনী বিদ্রোহে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় এবং অসংখ্য জনপ্রিয় প্রতিবাদী ঘটনাগুলোর পর সি পি আই (এম) নেতৃত্ব দেওয়ালের লিখন পড়তে অক্ষম হয়, জনগণের ভাষাকে বুঝতে অস্বীকার করে। যার ফলে সে জনগণ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের চোখে চূড়ান্তভাবে নিন্দিত হয়ে ওঠে। কৃতকর্মের জন্য আন্তরিকভাবে ভুল স্বীকার ও শুদ্ধিকরণের তোয়াক্কা না করে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের ঔদ্ধত্যপূর্ণ তর্জন গর্জন, জনগণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহিলা সম্পর্কিত কদর্য প্রচার উল্টে এদেশের বাম আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাকেই দেখিয়ে দিল।

এই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পরেও, সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে

গভীরে প্রোথিত প্রকৃত কারণসমূহকে সনাক্ত করার রাজনৈতিক ইচ্ছা বা সৎসাহস দেখা যাচ্ছে না। বরং তাঁরা হরেকরকম ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং সরকারি স্তরে নানা ঘাটতিগুলোর ভাসা ভাসা কথাবার্তা বলতেই ব্যস্ত রয়েছেন। প্রকৃত রোগকে ইঙ্গিত করে তার লক্ষণ সম্পর্কে কিছু বিরোধী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলেই আশু পার্টি শৃঙ্খলার অজুহাতে তা তিরস্কৃত করা হচ্ছে।

এ আই এল সি-র সুচিন্তিত মত হল, পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম)-এর এই বিপর্যয়কে কখনই বাম রাজনীতি ও মতাদর্শের গণপ্রত্যাখ্যান হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন সরকারটি বাম রাজনীতি ও মতাদর্শ বহুবছর আগেই শিকেয় তুলে সেই নয়া-উদারনৈতিক এজেণ্ডাকেই রূপায়িত করতে শুরু করে যা সে অন্যত্র বিরোধিতা করার দাবি করে থাকে। সেই কর্মসূচীকেই তারা রূপায়িত করল যা আপাদমস্তক কর্পোরেটমুখী নীতি এবং তাদেরই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আর তার বিনিময়ে জলাঞ্জলি দেওয়া হল জনগণের বুনিয়াদী অধিকার ও ন্যূনতম স্বার্থ। এটাই পরিহাস যে, পশ্চিমবাংলায় শাসক বামেদের ক্রমবর্ধমান দক্ষিণমুখী যাত্রার পরিণতিতেই দক্ষিণপন্থীরা জনমোহিনী রূপ ধরে ফিরে এল ক্ষমতার মসনদে। আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে জমি-জীবিকা ও গণতন্ত্রের বুনিয়াদী দাবিগুলোতে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক মানুষের যে ক্ষোভ ছিল, তার ওপর দাঁড়িয়েই গত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের অভাবনীয় উত্থান ঘটেছে।

১৯৭৭ সালে, বামফ্রন্ট সরকার তার যাত্রা শুরু করেছিল এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, তাদের সরকারটি কাজ করবে জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। তারপর সেই সরকার অপারেশন বর্গা, জমির পুনর্বণ্টন, পঞ্চায়েত রাজ মারফত তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার এজেণ্ডা নিয়ে আসে। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবি হাজির করে। কিন্তু প্রথমাবস্থার এই গতিশীলতা স্তিমিত হয়ে আসার পর সরকার পরবর্তী স্তরের জনমুখী সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়। আর, ১৯৯০-এর মাঝামাঝি থেকে, এই সরকার 'খোলা বাজার' মারফৎ নয়া-উদারনৈতিক উন্নয়নের পথরেখা ধরে উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ ও ভুবনীকরণের এজেণ্ডাকেই কার্যত আঁকড়ে ধরে। বস্তুত সি পি আই (এম) এই সমস্ত নীতিগুলোর মধ্যে একটা বিরাট গুণ আবিষ্কার করে ফেলে, আর তা হল, কেন্দ্রের কাছ থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার দায় আর রাজ্য সরকারগুলোকে বইতে হবে না; রাজ্যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে সমাদৃত করে ডেকে আনতে তারা এখন পুরোপুরি স্বাধীন! ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের রূপায়িত নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন এক শিল্পনীতি গ্রহণ করল। আর

২০০৩ সালের মধ্যে এই সরকার তার নিজস্ব এক সেজ আইন নিয়ে ভাবনা চিন্তা এবং বৃহদায়তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে জমির ঊর্ধবসীমা আইনকে শিথিল ও বিপরীতমুখী করার প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। এ সমস্ত পশ্চিমবাংলায় নিছক কিছু পথভ্রষ্ট প্রশাসনিক পরিবর্তন ছিল না। কেরলেও সি পি আই (এম) একই পথের পথিক হল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সি পি আই (এম) এই লক্ষ্যেই তার পার্টি কর্মসূচীকে পাল্টে নতুন এক শব্দবন্ধনী আবিষ্কার করল "উন্নয়নই হল শ্রেণী সংগ্রাম"। ২০০৬ সালে সিঙ্গুর ঘটনার সময়ে আমরা দেখলাম যে বামফ্রন্ট সরকারই যে শুধু টাটার স্বার্থে জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ করেছে তাই নয়, সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিঙ্গুর আন্দোলনের সমর্থকদের অভিযুক্ত করে নারোদবাদী (রাশিয়ায় এটা ছিল এক পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ধারা, যারা ক্ষুদে উৎপাদনের প্রতি আবেগতাড়িত ছিল এবং সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ হিসাবে বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করত) অথবা লুডাইটপন্থী (বহুদিন আগেকার প্রতিরোধকারী শ্রমিক, যাঁরা যন্ত্রপাতিকে তাঁদের শত্রু হিসাবে গণ্য করে, মেশিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সেগুলোকে ভেঙ্গেচুরে দেয়) ধারা অনুসরণ করার জন্য! যখন নন্দীগ্রাম ঘটল এবং পশ্চিমবাংলা সহ অন্যান্য জায়গায় সমগ্র গণতান্ত্রিক মতামত একের পর এক হত্যাকাণ্ডকে নিন্দা করতে লাগল, তখন সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এটাকে অতি দক্ষিণ ও অতি বামেদের মিলিত এক বাম বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করে। আর, লালগড়ের আদিবাসী জনতা যখন পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তখন সি পি আই (এম) সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করে যৌথ আধা সামরিক অভিযান নামিয়ে আনল এই আদিবাসী বিক্ষোভকে দমন করতে। চিদাম্বরমের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অপারেশন গ্রীণ হান্টের তত্ত্ব ও অনুশীলনকেই সে প্রয়োগ করল।

আর এ প্রশ্নেই, ক্ষমতায় আসীন কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য থেকে সরে আসার সবচেয়ে বড় মৌলিক বিচ্যুতিটি আমরা লক্ষ্য করি। নির্বাচনী লড়াইয়ের মাধ্যমে স্থানীয় ক্ষমতায় কমিউনিস্টদের চলে আসার সম্ভাবনার বিষয়টি স্বীকার করলেও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমস্ত কমিউনিস্টদের কাছে ঐ সমস্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোকে সমগ্র কমিউনিস্ট পরিপ্রেক্ষিতের ওপর দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বিরোধীপক্ষের অনুশীলন রপ্ত করার শিক্ষাই হাজির করেছে। শেষের পর্যায়ে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার পরীক্ষা-নিরীক্ষাটি হল এই বুনিয়াদী দিকনির্দেশটিকে পুরোপুরি উল্টে দেওয়া—যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ধ্রুপদী নির্যাস হিসাবে বেরিয়ে আসে। সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বিকশিত হওয়ার বদলে, তা শ্রেণী সমঝোতার সরকারে

অধঃপতিত হয়। কর্পোরেটমুখী নীতিগুলোকে অনুসরণ করতে জনগণের আন্দোলনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। জনগণকে জরুরী রিলিফ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি সে প্রথমদিকে করেছিল, তার প্রতি এই সরকারটি ক্রমেই নির্লিপ্ত হয়ে পড়ল। পাশাপাশি, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে সে খোলাখুলিভাবেই কর্পোরেট বিনিয়োগকারীদের প্রতিযোগিতার স্বার্থে নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়া শুরু করল রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করার অজুহাতে। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বনাশা বিচ্যুতির অভিজ্ঞতা আগামীদিনে গোটা দেশে সমস্ত বাম নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোর কাছে এক সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করবে।

সি পি আই (এম)-এর কাছে পশ্চিমবাংলার মডেলটির প্রভাব হয়ে দাঁড়াল সর্বব্যাপী। তিন দশক পর্যন্ত এই 'উত্তরণশীল' সরকারটি টিকে থাকায় সি পি আই (এম) এই সরকারের ভবিষ্যত গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে উদ্যোগহীন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে দূরদর্শিতার অভাব দেখা যায়। সরকারের 'স্থায়িত্ব'কে শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ সাফল্য এবং বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবাংলাকে ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রবর্তী স্তম্ভ হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়। সরকারের স্থায়িত্ব পার্টির নীতিগত সিদ্ধান্তগুলোকে মোক্ষমভাবে প্রভাবিত করতে লাগল। সি পি আই (এম)-এর গোটা রাজনৈতিক জগৎই আবর্তিত হতে থাকল তার দীর্ঘতম পর্যায়ে টিকে থাকা সরকারটিকে ঘিরে; অন্যান্য রাজ্যে বা কেন্দ্রে হরেকরকম অ-কংগ্রেসী, অ-বিজেপি বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সঙ্গে যোগসাজশ করে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা সে দেখতে শুরু করল। ২০০৪-২০০৮ পর্যন্ত সি পি আই (এম)-কে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে পরোক্ষে ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারা করতে দেখা গেল বিজেপিকে মসনদ থেকে দূরে রাখার অজুহাতে। ঐ সুবিধাবাদী নির্বাচনী হিসাব নিকেষের সংকীর্ণ ভিত্তির ওপরই সি পি আই (এম)-এর 'বাম ঐক্য' ও 'যুক্তফ্রন্ট' কার্যকরী ছিল। আর এই পরিসরে যে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি এবং জনগণের আন্দোলন খাপ খেত না, সেগুলোকেই চিহ্নিত করা হোত 'বাম বিরোধী' বলে।

বামফ্রন্ট সরকারের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই (এম) নির্দেশিত সরকার-কেন্দ্রীক বাম ঐক্যের মডেলেরও পতন ঘনিয়ে এল। এই সন্ধিক্ষণে সারা ভারত বাম সমন্বয় সমস্ত নিষ্ঠাবান বামশক্তি; সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের কাছে যৌথ ও ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং পারস্পরিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে আরও কাছাকাছি আসার আহ্বান রাখছে। এক গভীর ও সার্বিক সংকটের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ চলেছে দ্রুতবেগে ধাবিত মুদ্রাস্ফীতি, তীব্রতম দারিদ্র ও বেকারত্ব, নিয়ন্ত্রণহীন দুর্নীতি এবং গণতন্ত্রের ওপর পরিকল্পিত আঘাত, এই সবকিছুকে সঙ্গে নিয়ে। আর জনগণকে সমাবেশিত করতে, অবিচলভাবে

গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে আমাদের দেশে প্রতিবাদী আন্দোলন ও বিকল্প ধ্যানধারণার মোটেই অভাব নেই।

শ্রেণী সংগ্রামের বুনিয়াদী পথ থেকে সরে আসায় সি পি আই (এম)-এর বামফ্রন্ট মডেল ভেঙ্গে পড়েছে। সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে অনুশীলনের জগতে শ্রেণীসমঝোতাবাদী আত্মসমর্পণকারী লাইন গ্রহণ করে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জনগণ এবং তাদের সেই সমস্ত সংগ্রাম থেকে যেগুলো গণতান্ত্রিক প্রশ্ন ও আকাঙ্খাকেই প্রতিবিম্বিত করে। সমস্ত সংগ্রামী বামশক্তিগুলো নতুনভাবে সংগঠিত হোক, জনগণের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে বাম আন্দোলন ও বাম রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটুক। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নয়নের সবচেয়ে অবিচল ও নিষ্ঠাবান শক্তি হিসাবে প্রকৃত বামপন্থীদের এগিয়ে যেতে হবে সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা রেখে।

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন;
ভীমরাও বনসোল, সাধারণ সম্পাদক, লাল নিশান পার্টি, মহারাষ্ট্র;
মঙ্গতরাম পাসলা, সম্পাদক, সি পি এম (পাঞ্জাব);
টি পি চন্দ্রশেখর, সম্পাদক, এল সি সি (কেরল)

সি পি আই (এম)-এর বিংশতি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব

সত্যকে অস্বীকার করে আর কতকাল?

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক

কেরলের কোঝিকোড়ে এ বছরের এপ্রিলে সি পি আই (এম)-এর যে বিংশতি কংগ্রেস হতে যাচ্ছে, সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তার খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। দলের পূর্ববর্তী পার্টি কংগ্রেস চার বছর আগে অনুষ্ঠিত হয় তামিলনাড়ুতে (কোয়েম্বাটুর, ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল, ২০০৮)। কোয়েম্বাটুর থেকে কোঝিকোড়ের পথে অতিক্রান্ত চার বছর সি পি আই (এম)-এর কাছে অভূতপূর্ব নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর্যায় হয়ে রয়েছে। এই পর্যায়ে লোকসভায় দলের সাংসদ সংখ্যা সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে কমে দাঁড়ায় এবং দল একইসাথে পশ্চিমবাংলা ও কেরলে ক্ষমতা হারায়। এই নির্বাচনী বিপর্যয় পূর্ববর্তী কোন সতর্কবার্তা ছাড়া সহসাই হাজির হয়েছে এমন নয়—সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনাবলীর পর থেকে দল পশ্চিমবাংলায় যে গণবিচ্ছিন্নতা ও গণপ্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হতে শুরু করেছিল, ক্ষমতা থেকে দলের অপসারণ সেটাকেই সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করছে মাত্র।

পশ্চিমবাংলার এই বিপর্যয়কে সি পি আই (এম) কিভাবে ব্যাখ্যা করছে? এই বিপর্যয় থেকে দল কি শিক্ষা নিতে চায়? সি পি আই (এম)-এর কর্মীবৃন্দ ও দেশের গোটা বাম শিবির আশা করে কোঝিকোড়ের আসন্ন কংগ্রেস থেকে এই প্রশ্নের একটা উত্তর বেরোবে। তবে, কোন পাঠক যদি খসড়া প্রস্তাবের মধ্যে এই বিষয়ে কোন আন্তরিক বিশ্লেষণ বা উত্তর খুঁজতে চান, তিনি নিদারুণ হতাশ হবেন।

খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব গোটা বিষয়টাকেই এড়িয়ে যেতে চেয়েছে এবং পশ্চিমবাংলায় দলের বিপর্যয়কে হাজির করা হয়েছে নিছক এক তথ্যের বিবরণী রূপে। 'বিশ্লেষণ' বলতে শুধুমাত্র রয়েছে দলের ১৯তম কংগ্রেসের তুলে ধরা এই বিপদসংকেতের উল্লেখ, "নয়া-উদারবাদী নীতিগুলোর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রণনৈতিক মৈত্রীর বিরোধিতায় সি পি আই (এম) যে ভূমিকা নিয়েছে তার ফলস্বরূপ দল শাসক দলগুলো ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলোর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ছে এবং দলের সবথেকে শক্তিশালী ঘাঁটি পশ্চিমবাংলা ইতিমধ্যেই আক্রমণের মুখে পড়েছে।"

অন্যভাবে বললে, সি পি আই (এম) আমাদের এই কথা বিশ্বাস করতে বলে যে, শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলো পশ্চিমবাংলায় সমস্ত ঘটনাগুলোকে আগে থেকে পরিকল্পনা করে সাজিয়েছে এবং সি পি আই (এম) এই চক্রান্তের শিকার হয়েছে। এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা কিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃত বিকাশ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে?

২০০৪ থেকে ২০০৮-এর পর্যায় এতটাই হালফিলের ব্যাপার যে জনগণের স্মৃতি থেকে তা মিলিয়ে যেতে পারে না। কংগ্রেস এবং সি পি আই (এম) এবং তার বাম শরিকদের মধ্যে লাগাতার সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই ইউ পি এ-১ টিকে থাকে এবং ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির পর বামপন্থীরা সমর্থন তুলে না নেওয়া পর্যন্ত ঐ সহযোগিতা চলে। পশ্চিমবাংলায় কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যমে 'ব্র্যাণ্ড বুদ্ধ'-কে নিয়ে সোচ্চার উচ্ছাসের ওপর ভর করে সি পি আই (এম) ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল বিজয় হাসিল করে। সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা এতটাই ব্যাপক এবং কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যমের সমর্থন এতটাই সরব ছিল যে, সি পি আই (এম) মনে করেছিল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনাবলীর থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিবাদকে তারা সহজেই উড়িয়ে দিতে পারবে।

একথা ঠিকই যে, শাসকশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদী চক্র এবং কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যম, সবই শেষপর্যন্ত সি পি আই (এম)-এর বিপক্ষে যায় এবং তা কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের পর, তার আগে নয়। রাজনৈতিকভাবে অন্ধ ছাড়া আর সবার কাছেই যখন জমি অধিগ্রহণের প্রতি কৃষকদের বিরোধিতার তীব্রতা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখনই কেবল সংবাদ মাধ্যমের অবস্থান সমালোচনামূলক হতে শুরু করে। আর তারপর নন্দীগ্রামের ঘটনার পরে পরে রাজ্যের বিপুল গণতান্ত্রিক জনমতকে বৈরীভাবাপন্ন করে তোলার ফলে সি পি আই (এম) আরও কলঙ্কিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ক্ষমতার যে ঔদ্ধত্য দিয়ে সি পি আই (এম) সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে চেয়েছিল, সেটা তার বিপর্যয়-পরবর্তী বিশ্লেষণের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া প্রস্তাবে অনেক রাজ্যের নামই উল্লেখিত হয়েছে। ঐ তালিকা থেকে লক্ষ্যণীয়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবাংলার নাম।

বিপর্যয়-পরবর্তী পর্যায়ে সি পি আই (এম)-এর উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত নিবন্ধ লিখেছেন, সেগুলোর সাথে খসড়া প্রস্তাবকে মিলিয়ে পড়লে এর কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর লেখার জবাবে প্রকাশ কারাত "দ্য ক্যারাভ্যান" পত্রিকায় যা লেখেন, তার দিকে তাকানো যাক। রামচন্দ্র গুহর "পতনের পর" (দ্য ক্যারাভ্যান, জুন ২০১১) নামক রচনার জবাবে প্রকাশ কারাত সিঙ্গুর সম্পর্কে এই সুনির্দিষ্ট মন্তব্যটি করেন ঃ "কোন ভুল যদি হয়ে থাকে তবে তা ছিল জমির স্থান নির্বাচন নিয়ে। ঐ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ছিল এবং বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতও তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যে ২০ শতাংশ মানুষ জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেন, তাঁরা কোন পরিস্থিতিতেই বাড়তি আর্থিক প্যাকেজ গ্রহণ করতেন না।" (দ্য ক্যারাভ্যান, নভেম্বর ২০১১)

এইভাবে সিঙ্গুরকে পর্যবসিত করা হয়েছে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের উসকে তোলা এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রূপে এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভুলটা ছিল শুধু স্থান নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক ভুলের মধ্যে! এটা হল সি পি আই (এম)-এর উটপাখির বালিতে মুখ গুঁজে রাখার মতো দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া ধরনের বিশ্লেষণের আর একটা

দৃষ্টান্ত। শত শত একর বহুফসলি জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্রোধ এবং কিছু মহিলার শুরু করা বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ যা দ্রুতই পরিণতি লাভ করল দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানে— কমরেড কারাতের কাছে এসবের কোন তাৎপর্যই নেই।

সিঙ্গুরে প্রতিবাদের প্রথম বিস্ফোরণ যখন ঘটল সি পি আই (এম) তখন ২০০৬-এর নির্বাচনের বিপুল বিজয়ের সাফল্যের শিখরে চড়ে। রতন টাটা সহ কর্পোরেট জগতের বেশ কিছু কেষ্টবিষ্টু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সদ্য সদ্য সোচ্চারে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস চূড়ান্ত হতোদ্যম হয়ে উদ্যোগহীন অবস্থায় রয়েছে, লোকসভায় তার আসন সংখ্যা মাত্র ১-এ এসে ঠেকেছে এবং বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের মর্যাদা পাওয়ার জন্য যে ন্যূনতম ১০ শতাংশ আসন দরকার (পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে ৩০) সেটাও সে পায়নি। সিঙ্গুরের প্রতিবাদ তৃণমূলকে সক্রিয়তা জোগায় এবং মমতা ব্যানার্জীর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার উড়ানক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

সিঙ্গুরের পর যখন নন্দীগ্রাম ঘটল, অনেকেই তখন এই ভেবে বিস্মিত হলেন যে, সি পি আই (এম) কেন সিঙ্গুর থেকে কোন শিক্ষা নিল না। স্থান হিসাবে সিঙ্গুরের নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে ভুল হওয়া সম্পর্কিত কারাতের মন্তব্য আমাদের একটা সূত্র যোগাচ্ছে। সিঙ্গুর থেকে সি পি আই (এম) এই শিক্ষাই নিল যে, পরবর্তী যে স্থানটা তারা নির্বাচন করবে, সেটা হবে সি পি আই (এম)/বামপন্থীদের শক্তিশালী জায়গা, সুতরাং তৃণমূল সেখানে বাগড়া দিতে পারবে না। নন্দীগ্রাম ছিল ঠিক এই ধরণেরই এক এলাকা, যেখানে নির্বাচনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্টের প্রাধান্য ছিল চূড়ান্ত। এবং সি পি আই (এম)-এর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ১৯৪০-এর দশকের তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকে স্থানীয় স্তরে কমিউনিস্ট রাজনীতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

এ সত্ত্বেও সিঙ্গুর উপাখ্যান থেকে সজাগ হয়ে উঠে নন্দীগ্রামে সি পি আই (এম)-এর সমর্থনভিত্তি জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনার ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল (নন্দীগ্রামে কোন জমি অধিগ্রহণ হয়নি বলে কারাত যা বলেছেন সেটা ঠিকই, তবে তিনি কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সরকার ব্যাপক পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের তোড়জোড় করছিল) এবং নন্দীগ্রাম সারা দেশের সেজ-বিরোধী কৃষক প্রতিরোধের কাছে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ নাম হয়ে উঠল। সি পি আই (এম)-এর দ্বারা চালানো গণহত্যা ও পেশি প্রদর্শন এবং চূড়ান্তভাবে অসমর্থনীয় জিনিসকে সমর্থন করার সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ প্রয়াস দলের কাছে পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করেই তুলল। দল আরও কলঙ্কিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, পশ্চিমবাংলায় তার দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন শাসনের ইতিহাসে অন্য কোন ঘটনার ক্ষেত্রে যা হয়নি।

"জমির ওপর কৃষকের অধিকারের জন্য এবং জোর করে জমি অধিগ্রহণের যে কোন ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য" খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব সি পি আই (এম) এবং তার কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল, সিঙ্গুরে

এবং বিশেষভাবে নন্দীগ্রামে সি পি আই (এম)-এর ভূমিকাকে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিটি আন্দোলনই সমস্বরে ধিক্কার জানায় এবং সি পি আই (এম)-এর প্রতিনিধিরা নন্দীগ্রামে নিজেদের অবস্থানের সপক্ষে দাঁড়াতে গেলে অনেক স্থানেই ঐ সমস্ত সংগ্রাম থেকে তাদের সরে আসতে হয়। আর তাই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে "নেতৃত্ব দেওয়ার" আগে সি পি আই (এম)-এর কি সর্বপ্রথমে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম প্রশ্নে দেশের কৃষক ও বাম আন্দোলনের কাছে একটা জবাবদিহি করা উচিত নয়?

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম ছাড়াও, জমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক প্রশ্নটাকে সি পি আই (এম) এখনও চরম অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখে থাকে। কর্পোরেট ও প্রমোটার লবির স্বার্থে নির্বিচার জমি অধিগ্রহণের বিষয়টাকে কৃষি ও কৃষক জনতার কাছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য শস্যের উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার সামগ্রিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে কি তাৎপর্য বহন করে, এ সম্পর্কে কোন মূল্যায়নও তাদের উপলব্ধিতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সি পি আই (এম)-এর মাথাব্যথা শুধুই যেন 'পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ' নিয়ে, যেখানে কৃষক এবং আদিবাসীরা সাধারণভাবে কোন মূল্যেই তাঁদের জমি হাতছাড়া করতে চান না।

রামচন্দ্র গুহকে দেওয়া তাঁর জবাবে প্রকাশ কারাত বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর তাঁদের 'আস্থা'র কারণেও তাঁর দল বিগত শতাব্দী পর্যন্ত পরিমণ্ডলের প্রশ্নটায় কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাঁর দল কেন সংসদে ২০০৫-এর সেজ আইনের বিরোধিতা করতে পারেনি, এ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রশ্ন করলে কারাত তাদের বলেন, কৃষক জনতার দিক থেকে বিষয়টাকে দেখার ব্যাপারটা সি পি আই (এম)-এর মাথায় আসেনি, কেননা শিল্পায়নের সম্ভাবনার প্রশ্নটা নিয়েই শুধু তাঁদের মাথাব্যথা ছিল। জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টাকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দিক থেকে বিবেচনা করতে সি পি আই (এম) কোনদিনই শিখে উঠতে পারবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় আছে।

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'অপারেশন গ্রীনহান্ট' সম্পর্কে সি পি আই (এম)-এর অবস্থান। মাওবাদীদের দমনের নামে এই অপারেশন হল রাষ্ট্রের নামিয়ে আনা এক দমনমূলক অভিযান, যে মাওবাদীদের ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ বলে তুলে ধরা হচ্ছে। খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ, যদিও মাওবাদীদের হিংসা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ সেখানে রয়েছে। মাওবাদীদের নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপ, অন্য দলের রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা এবং বিভিন্ন বুর্জোয়া দলকে সমর্থনের মধ্যে দিয়ে তারা যে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা দেখিয়ে থাকে—সর্বশেষ উদাহরণ হল পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলকে মদত—দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি আন্তরিক ধারাকেই যে সেসবের সমালোচনা ও সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে তা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

কিন্তু বামেদের কোন অংশ অপারেশন গ্রীনহান্ট প্রশ্নে কিভাবে নিশ্চুপ থাকতে পারে? এর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যাপার হল, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই দুরভিসন্ধিমূলক অভিযান থেকে নিজেদের দূরে

রাখতে চাইলেও পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় থাকার সময় সি পি আই (এম) ছিল অপারেশন গ্রীনহান্টের সক্রিয় প্রবক্তা।

বনাঞ্চলই তাদের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে ওঠায় খনিজ-সমৃদ্ধ অনেক অঞ্চলেই মাওবাদীদের কিছু জোরালো উপস্থিতি রয়েছে। এই অঞ্চলগুলো আবার কর্পোরেটের জমি ও খনি দখলেরও উপদ্রুত অঞ্চল। খুব স্বাভাবিকভাবেই, এই সমস্ত অঞ্চলের অনেকগুলোই কর্পোরেট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কৃষক ও আদিবাসী প্রতিরোধের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোতে মাওবাদীদের জড়িত হওয়া বা হস্তক্ষেপের ধরন ও তার পরিণতি নিয়ে (পশ্চিমবাংলার লালগড় যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ) কারুর সমালোচনা থাকতেই পারে। কিন্তু অপারেশন গ্রীনহান্টের লক্ষ্য যে ঐ প্রতিরোধকে চূর্ণ করা এবং ঐ প্রতিরোধের সমর্থনকারী যে কোন প্রগতিশীল কণ্ঠস্বরকে সন্ত্রস্ত ও স্তব্ধ করা, এই ঘটনাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যাবে না।

সি পি আই (এম)-এর খসড়া প্রস্তাব শুধু যে অপারেশন গ্রীনহান্টের গণতন্ত্র-বিরোধী তাৎপর্য সম্পর্কে নীরব তাই নয়। মাওবাদীরা "সশস্ত্র কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জনগণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয় এবং এইভাবে রাষ্ট্রের আক্রমণের পুরো ধাক্কাটা আদিবাসী জনগণের ওপর ডেকে নিয়ে আসে", মাওবাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে খসড়া প্রস্তাব কর্পোরেট লুণ্ঠন ও আদিবাসীদের প্রতিরোধের সমগ্র ইস্যুটা সম্পর্কে তার অগভীর উপলব্ধিকেও প্রকাশ করেছে। মাওবাদীরা রঙ্গমঞ্চে আসার অনেক আগে থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্র আদিবাসীদের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং নয়া-উদারবাদী নীতির পর্যায়ে বিশ্ব পুঁজি কর্তৃক দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাতের পথে রাষ্ট্র যখন আদিবাসী/ভূমিপুত্র জনগণকে বাধা বলে মনে করছে, তখন থেকে আদিবাসী জনগণের ওপর রাষ্ট্রের আক্রমণ বহুগুণ বেড়ে উঠেছে।

খসড়া প্রস্তাব কৃষক জনতা ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বিষয়গুলোতে আরও বেশি সংবেদনশীলতা দেখাতে চেয়েছে। তবে, নিজেদের শক্তিশালী জায়গাতেই জমি অধিগ্রহণের ইস্যুগুলোতে সি পি আই (এম)-এর উদ্ধত ও কৃষক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিষয়ে অস্পষ্ট অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সংশয় রয়েছে, এই সংবেদনশীলতার কতটুকু সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপে ও কোন বিশ্বাসযোগ্য আন্দোলনে কখনও কি রূপান্তরিত করা যাবে! খসড়া প্রস্তাবের যে অংশে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কাশ্মীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেখানেও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও মানবাধিকারের বিষয়ে সি পি আই (এম)-এর দোদুল্যমানতা ধরা পড়ছে। সি পি আই (এম) সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনকে বাতিল করার দাবি তুলতে পারেনি, সে শুধু নির্বাচিত কিছু অঞ্চল থেকে ঐ আইনের আংশিক প্রত্যাহারের দাবিই জানাতে পেরেছে।

খসড়া প্রস্তাব তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ বা গোর্খাল্যাণ্ডের মত নতুন নতুন রাজ্য গঠনের দাবির প্রতি সি পি আই (এম)-এর বিরোধিতাকে আর একবার প্রকাশ করেছে। সি পি আই (এম) বলছে, তাদের এই বিরোধিতা ভাষা-ভিত্তিক পুনর্বিন্যাস এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর

গণতান্ত্রিকীকরণের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আঞ্চলিক পশ্চাদপদতা বা বৈষম্যের সর্বরোগহর দাওয়াই হিসেবে ছোট ছোট রাজ্য গঠনের নির্বিচার ওকালতির প্রতি দলের বিরোধিতার কথা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, যেখানে ঐ ধরনের দাবির মূলে রয়েছে কোন সম্প্রদায় বা অঞ্চলের আত্মপরিচিতির ঐতিহাসিক আকাঙ্খা এবং তার পিছনে রয়েছে ব্যাপক ধারাবাহিক জনসমর্থন, সেখানেও কেন সি পি আই (এম)-কে দাবিগুলোর বিরোধিতা করে যেতেই হবে? একদফা ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসকে কেন শেষ কথা বলে ধরা হবে আর কেনই বা নতুন একটি রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের নীতির প্রতি ক্ষতিকারক বলে গণ্য করা হবে? নেপালি ভাষা যদি সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তবে স্বতন্ত্র গোর্খা রাজ্যের ধারণা ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসের মর্মবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না কেন?

সি পি আই (এম) বরাবরই বাম ও গণতান্ত্রিক মঞ্চ গড়ে তোলার যে আহ্বান দিয়ে থাকে, খসড়া প্রস্তাবে তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে এবং তার জন্য ১৭ দফা কর্মনীতি ও দাবিসনদের এক রূপরেখা হাজির করা হয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক মঞ্চের ওপর নতুন করে এই গুরুত্ব প্রদান কি তৃতীয় ফ্রন্ট বা ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট নিয়ে দলের সাম্প্রতিক পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে সরে আসার কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে? প্রস্তাবটি একটু খুঁটিয়ে পড়লেই একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ঐ ধরনের কোন ভাবনা সি পি আই (এম)-এর নেই। প্রয়োগের দিক থেকে অ-কংগ্রেস অ-বিজেপি দলগুলোর সঙ্গে যেখানেই সম্ভব নির্বাচনী আঁতাত ও সমঝোতা গড়ে তোলার ওপর সি পি আই (এম) যে ব্যবহারিক জোর দিয়ে থাকে, বাস্তব জীবনে বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পের ধারণা তারই অধীনস্থ হতে থাকবে।

কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি, সি পি আই (এম)-এর বুর্জোয়া মিত্ররা কিভাবে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির ইস্যুতে তাকে পরিত্যাগ করে গেছিল। এটাও সংশয়াতীত যে, এই মিত্রদের কারুরই—যারা মূলত বিভিন্ন রাজ্যের শাসক বা প্রধান বিরোধী দল—১৭ দফা বাম ও গণতান্ত্রিক সনদের বিষয়বস্তুতে কোন আগ্রহ নেই। যুক্তফ্রন্টের যে নীতি সি পি আই (এম) অনুশীলন করে এসেছে, সেটা তাকে পশ্চিমবাংলা, কেরল ও ত্রিপুরার বাইরে মাঝে-মধ্যে ভালো সংখ্যক আসন লাভ করতে বা কিছু বেশি ভোট পেতে সাহায্য করে থাকতে পারে। কিন্তু সি পি আই (এম) যাকে বলে বামেদের স্বাধীন ভূমিকা বা তাদের সামনে আনা, সেটাকে শক্তিশালী করে তুলতে ঐ নীতি কি কোনভাবে তাদের সাহায্য করেছে? বুনিয়াদি শ্রেণীর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে 'পিছিয়ে থাকা' নিয়ে সি পি আই (এম) যে বিলাপ করে থাকে, তাকে কাটিয়ে উঠতেও কি ঐ নীতি কোনভাবে সাহায্য করেছে? এই প্রশ্নগুলোকে স্বীকার করার সাহসটুকু পর্যন্ত সি পি আই (এম)-এর বিংশতি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব দেখাতে পারেনি।